KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেন্স, কল-৪৫
Collection : KLMLGK	Publisher কিরণশঙ্কর চক্রবর্তী
Title অন্যদিন (ANYADIN)	Size 8.5"/5.5"
Vol & Number 18-19 21 22 23	Year of Publication : ১৩৮১ Dec - March 74-75 ১৩৮২ ১৩৮২ Jan - March 1976 Condition : Brittle Good
Editor কিরণশঙ্কর চক্রবর্তী	Remarks

CD. Rol No KLMLGK

রবীন্দ্র প্রণাম সংখ্যা

অন্যদিন

কবিতা ত্রৈমাসিক

সম্পাদক
শিশির ভট্টাচার্য

শীত-বসন্ত ১৩৮১ অষ্টাদশ-উনবিংশ সংকলন

কবি প্রণাম

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

তবুও তোমারই স্মৃতি
সুনিবিড় চৈতন্যের কোষে
হে কবীশ—
মধ্যাহ্নের নীলে
সমারোহ কৃষ্ণচূড়া দিনে।
অপরাহ্নে স্মৃতিঘেরা আলোড়িত গৈরিক প্রেক্ষণে
অন্ধকার ঘন হয়ে এলে।

পুরানো পোষাকগুলি ছিঁড়ে
দর্পণেতে যতোবার দেখি, অন্য কারো ছায়া মনে হয়,
এবং বিস্ময়
জাগে চতুর্দিকে আর কেউ নেই।
মনে হয় বার বার
কি জানি এ অন্যকার
চোখে যেন আমাদেরো চোখ।
অনুভূতি ভেঙে,
সময় পেরিয়ে ওই একই মাথা আকাশেতে ঠেকে।

অতঃপর বীজ থেকে ফুলে কিম্বা ফুল থেকে বীজে
ঘুরে ফিরে একই খেলা দেখে
যেতে যেতে যেতে…
যতোবার নতুনতা নেই
হে কবীশ—
দ্বিধাহীন জানি
সাধ্য নেই তোমাকে এড়াই ॥

TAPAS
67/5, Seven
COSSIPORE CLUB
CALCUTTA-700002

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠিপত্র ১১

একদা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সহকারী প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ১৩৮টি পত্র; পরিশিষ্টে ৫টি কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথ কৃত শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের আলোচনা সংকলিত। মূল্য ১০.০০, শোভন ১২.০০ টাকা।

●

পূর্ব-প্রকাশিত এবং বর্তমানে প্রাপ্তব্য চিঠিপত্রের অন্যান্য খণ্ড

খণ্ড ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত ॥ ৩.০০

৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত ॥ ৩.০০

৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত ॥ ৫.০০

৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্ঝরিণী সরকারকে লিখিত ॥ ৩.০০

৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত ॥ ৫.৫০ ; শোভন ৭.০০

৯। হেমন্তবালা দেবী ও পরিবারের অন্যান্যকে লিখিত ॥ ৭.০০

১০। দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত ॥ ২.৫০

—

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত ॥ ৫.০০

পথে ও পথের প্রান্তে। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত ॥ ২.০০

ভানুসিংহের পত্রাবলী। শ্রীমতী রাণু দেবীকে লিখিত ॥ ১.৫০

রবীন্দ্রনাথ এণ্ডরুজ পত্রাবলী। শ্রীমলিনা রায় —অনূদিত ॥ ৬.০০

বিশ্বভারতী

কার্যালয়ঃ ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা-১৬

বিক্রয়কেন্দ্রঃ ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

অন্যদিন

অবৈতনিক সম্পাদক ঃ শিশির ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ জীবন সরকার

অন্যদিন প্রধানত তরুণ কবিদের ত্রৈমাসিক মুখপত্র। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক জীবনধর্মী কবিতা ও আলোচনা সাদরে গৃহীত হবে। চিঠির উত্তর পেতে হলে অনুগ্রহ করে ডাকটিকিটযুক্ত নাম ঠিকানা লেখা নাম পাঠাবেন।

●

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস, ক'লকাতা-৪৫
ফোন ৪৬-৩৭১৪।

●

সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, ক'লকাতা-৬ থেকে হরিপদ পাত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও শিশির ভট্টাচার্য কর্তৃক ৫৮/১২৮ লেক গার্ডেনস ক'লকাতা-৪৫ থেকে প্রকাশিত। প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ কমল সাহা, প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ইম্প্রেশন হাউস ঃ ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, ক'লকাতা-৯

প্রচ্ছদের রবীন্দ্রনাথের স্কেচটি জীবনানন্দ সম্পাদক পলাশ মিত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

●

দাম ঃ দেড় টাকা। বার্ষিক ঃ ছয় টাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

শীত-বসন্ত সংখ্যা ১৩৮১
অষ্টাদশ-ঊনবিংশ সংকলন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

অন্যদিন

প্রবন্ধ

দীর্ঘ কবিতায় কবির ভাবনা ও প্রস্তাবনা ঃ মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
নজরুলের বিদ্রোহ ও তার স্বরূপ ঃ সুশীল সেনগুপ্ত

কবিতা

কবি প্রণাম ঃ শিশির ভট্টাচার্য

অতিন্দ্রীয় পাঠক * অন্যমন দাশগুপ্ত * অনন্তকুমার সাহা * অসীম বসু * অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায় * ওয়াজেদ আলি * কুমারেশ বন্দ্যোপাধ্যায় * কার্তিক মোদক * কার্তিক মিত্র * কল্যাণ আচার্য * কুমারেশ চক্রবর্তী * কৃষ্ণ ধর * গিরিধারী কুন্ডু * গৌরাঙ্গ ভৌমিক * জীবন নাথ * জীবন সরকার * জগন্নাথ বিশ্বাস * জয়ন্ত চক্রবর্তী * তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় * তপনকুমার ঘোষ * তপন বন্দ্যোপাধ্যায় * দেবোপম চক্রবর্তী * দেশ ভাটিয়া * দেবব্রত মণ্ডল * নীরদ রায় * প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ * প্রদীপ রায়চৌধুরী * পরেশ সাহা * প্রবীণ সরকার * প্রণব মাইতি * প্রশান্ত রায় * পলাশ মিত্র * বেণু সরকার * বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় * ভাস্বতী রায়চৌধুরী * মহফিল হক * মণীন্দ্র গুপ্ত * রজত মিশ্র * রবীন সুর * শুক্লা দে * শান্তনু দাস * শোভনকুমার সরকার * শিশির গুহ * সুশীল রায় * সমর মজুমদার * সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় * সুকুমার গরানী * সুচেতা মিত্র * সমীর চট্টোপাধ্যায় * সমীর ঘোষ * সুতপা মিত্র * সুগত বড়ুয়া * সুধীর ঘোষ * সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত * হরপ্রসাদ মিত্র * শিশির ভট্টাচার্য

বিদেশী ভাষা থেকে

জার্মানী

গুন্টার গ্রাস

অনুবাদঃ কবিরুল ইসলাম

রাশিয়া

বরিস পাস্তেরনাক

অনুবাদঃ নচিকেতা ভরদ্বাজ

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে

মারাঠি

বীণা আলাসে

অনুবাদঃ প্রবাসী বিনয়কৃষ্ণ

চিঠিপত্র

কবি পরিচিতি

জলপাইগুড়ি—দিলীপ রুদ্র

আলোচনা

আশিস নাহা

কবিতার খবর

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দীর্ঘ কবিতায় কবির ভাবনা ও প্রস্তাবনা

কবিতায় কল্পনার স্থান বড়ো বেশী ব্যাপক-বিস্তৃত। কল্পনা কবির আবেগনীল হৃদয়ে ছায়া ফেলে,—কবি সেই চিত্রিত ছায়ার আড়ালে নিজেকে গোপন করে একের পর এক ছবি এঁকে চলেন ; এই ছবির ব্যবহারের মধ্যবর্তিতায় উপলব্ধি-অভিজ্ঞতার প্রকাশ স্তরে স্তরে বিমূর্ত হয়ে ওঠে। মানবিক অনুভূতি, নৈসর্গিক মুগ্ধ-বিমুগ্ধবোধ, অন্তর্মুখীন চিন্তা-চেতনা, উপলব্ধিঃ—অভিজ্ঞতার সংবেদনায় আমাদের নীরবতার রহস্য উন্মোচন করে কথা বলে ওঠে। কল্প-কল্পনা কবির মনোগত ভাব-ভাবনার রূপময়তার উজ্জ্বল-উদ্ধার।

ভাব-ভাবনার ব্যাপ্তি, চিন্ত, চিন্ত-উদ্বেজক ঘটনা পরম্পরা, মানসিক স্থৈর্য স্থৈর্যহীনতার আর্তি, তৃপ্তি-অতৃপ্তির আহ্বানে জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায় অংশ গ্রহণ করতে পারা না পারার ব্যর্থতা, আনন্দময় ভাবনা কবিতার প্রকৃতিকে আয়তনগত তাৎপর্যে দীর্ঘ, কখনো মিত আয়তনের সীমানায় বেঁধে রাখে। যে সব কবিতায় ভাবনা, শব্দকল্প, চিত্র-চিত্রণ কেবলমাত্র ক্ষণিকের ইঙ্গিতময়তা ও প্রচ্ছন্ন ভাবাবেগের দ্রুত-দ্রুতিতে শেষ হয়ে যায় ; যার শ্রুতি প্রাথমিক বিচারে মধুর হোলেও ব্যঞ্জনার স্থায়িত্বে '.....a terrible beauty is born' অর্থে প্রদীপ্ত নয় ; আয়তনে দীর্ঘ সেইসব কবিতাকে দীর্ঘ কবিতা বলতে মন তেমন সাড়া দেয় না ; শুধুমাত্র বর্ণনানৈপুণ্য, আখ্যানের পর আখ্যান নির্ভর করে কবিতা দীর্ঘ করার মধ্যে আধুনিক দীর্ঘ কবিতার সাফল্য নিহিত থাকতে পারে না—চিন্তা-চিন্তন, মন-মানসিকতার অন্তঃ বহিঃর্জাগরণ, চেতন-অবচেতনার স্বপ্নময় জিজ্ঞাসা, স্বপ্নে-স্বপ্ন দূরবর্তী হওয়ার আকৃতি, স্মৃতি-স্মৃতির কাছে ফিরে এসে বেদনা জাগানো সর্বৈব

অর্থহীন মনে করার অভিজ্ঞান দীর্ঘ কবিতার সম্ভাব্য সাফল্যের অনুসন্ধেয়—তাই দীর্ঘ কবিতার প্রকৃতি ও পরিচয় হলো ঃ

……More typical, and distinctive, modern poem is of moderate length, articulated in sections, organised not narrationally but thematically, and often containing within relatively short compass a variety of tone—lyrical, satirie, meditative, prophetic [Collins Albatross Book of Longer Poem ঃ Edeoin Morgan]—'এ ভ্যারাইটি অব্ টোন'-এর সংযুক্তিতে ধ্যাননীল চিন্তার ভবিষ্যৎ বক্তা হয়ে উঠতে পারার মধ্যে দীর্ঘ কবিতার লক্ষণাক্রান্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিহিত।

সাহিত্য শিল্প ভাবনা যুগোপম চিন্তাচেতনার স্বরূপ প্রকাশের অবলম্বন ; রুদ্ধ ভাবনার উৎস মুখ নবচেতনার আনন্দময় উপলব্ধির খরস্রোতে উন্মীল হয়ে ওঠে শিল্প-সাহিত্য ভাবনার উৎকর্ষে। কবি তাঁর অভিজ্ঞতা—মমত্ব-বোধের স্পর্শে শব্দ-শব্দকল্পকে কবিতার দীর্ঘ ভাব-ভাবনা ও মানসিক প্রক্ষেপে এক-একটি নির্দিষ্ট ফর্মের সম্পূর্ণতায় মূর্তিদান করেন। এরই ফলে রসস্নাত বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে ও গভীর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে তোলে যা এক হৃদয় থেকে অন্য হৃদয়কে আবেগের দ্যোতনায়, চিত্রকল্পের চিত্রল ব্যবহারে, শব্দ-শব্দ সংযুক্তিতে পূর্ণ করে তোলে ভাবনাকে মহত্তম ব্যঞ্জনায় ছড়িয়ে দিতে।

সৌন্দর্য আনন্দজ্ঞান, ক্লান্তি-ক্লান্তি অপনোদনের ঔজ্জ্বল্য, প্রতিবাদের স্বতঃপ্রেরণা, বিদ্রোহের স্ফুরণ, অন্তঃ বহির্প্রকৃতির মিলন ও জাগরণ এই পারম্পরিক ভাবনা দীর্ঘ কবিতায় ছবির পর ছবির ব্যবহারে মানসিকতার সীমা অতিক্রম করে, এইসব ভিন্ন-অভিন্ন অনুষঙ্গ দীর্ঘ কবিতার চালচিত্রে শব্দ—শব্দ পরম্পরা সূত্রে গ্রথিত ভাবনার মালা হয়ে ওঠে ; আয়তনে সংক্ষিপ্ত কবিতার রূপ নির্মাণে অনেক কারণেই যা সম্ভব নয়। চিত্রকল্পের চিত্রল সৌন্দর্যের ছড়ানো বিন্যাস আয়তনে সংক্ষিপ্ত কবিতায় ভাবনার সমগ্রতাকে 'কনডেন্স ইমেজে' প্রকীর্ণ করে। 'বনলতা সেনের' চোখের উপমাকে 'পাখির নীড়ের মতো' বলতে ও দু দণ্ড শান্তি—স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার নিশ্চিত আশ্রয় মনে করে নিতে স্মৃতিকে মুহূর্তের জন্য প্রলুব্ধ করে আমাদের মগ্ন অনুভূতিকে দ্রবময় করার আকাঙ্ক্ষায় ; যেমন লক্ষ্য করা গেছে ইয়েটস-এর

কবিতায় শব্দের মিত ব্যবহারে ছবির প্রয়োগ নৈপুণ্যে শব্দ ব্যঞ্জনা তৈরীর প্রচেষ্টা। জীবনের উপান্তে এসে ইয়েটস-এর মন 'স্টোইক নির্বেদে' ভরে উঠেছিল—জীবন ও এই পারিপার্শ্বিক ভুবন দুই-ই তাঁর কাছে সাময়িক অর্থে বেমানান মনে হয়েছিল ; যারই আর্ত প্রতিবেদনে মুখর হয়েছে তাঁর Under Ben Bulben অর্থাৎ :

Cast a cold eye
On life, on death
Horsemmn pass by
[Under Be Bulbenn ঃ Last Poems : W. B. Yeats]

এই শব্দ—শব্দকল্পের সৌন্দর্যময়তা ছড়ানো অর্থে ব্যাপ্ত—বিস্তৃতিতে উজ্জ্বল নয়, সংহত রূপ নির্মাণেই মিত আয়তনের কবিতায় কবির অভিপ্রেত। সংক্ষিপ্ত কবিতার 'কনডেন্স ইমেজ'-এর সিঁড়ি ভেঙে দীর্ঘ কবিতার 'ফ্রী ইমেজে' অনুপ্রবেশ করলে চোখের আলো জ্ঞানময়তায় দীপ্ত মনে হয় ; এবং আমাদের মনোযোগ সংহত রূপময়তার চিত্রিত উপমা থেকে 'আকাশ ছড়িয়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে' এই ব্যাপ্ত ভাবনার সীমাহীনতার বর্ণিত উদ্দেশ্যে বিস্তার লাভ করে। জীবনানন্দের অবসরের গান, কয়েকটি লাইন, অনেক আকাশ, পরস্পর বোধ, ক্যাম্পে, জীবন, ১৩৩৩, প্রেম, পিপাসার গান, মনোবীজ, পরিচায়ক, আট বছর আগের একদিন, এই জাতীয় কবিতা। এইসব কবিতার ভাবনার উত্তরণ ঘটেছে চিত্রকল্পের সংহত রূপময়তা থেকে ব্যাপ্ত- বিস্তৃত চিত্রকল্পের ক্যানভাসে। এই ছড়ানো ব্যাপ্ত চিত্রকল্পে জীবনের সৌন্দর্যময়তা ও বিবর্ণ-পর্যুদস্ত মানসিকতা অমোঘ চিত্রলতাকে দৃশ্যময় করে তুলেছে ঃ 'রোদের নরম রং শিশুর গালের মত লাল" অথবা, 'দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ/মরণের সাথে লড়িয়াছে' কিংবা Let us go you then and I/Where the evening is spread out against the sky/Like a patient etherised upon a table—এই ব্যাপ্ত চিত্রকল্পের বিস্তার…the widening sphere of human sensibility'র সম্মোহ-সৃষ্টিতে উজ্জ্বল। দীর্ঘ কবিতার ভাবঘন গভীরতার মায়া লোকে প্রবেশের প্রথম দুয়ার খুলে যায় এই চিত্রকল্পের সংযোগময়তার আঘাতে আঘাতে ঃ

মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ, লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রুর
খল জল ছল-ভরা, তুলি লক্ষ-ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ !

[দেবতার গ্রাস ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

এই আপাত অস্থিরতা ভয়াল প্রতিবেদনের আবেগনীল ব্যঞ্জনায় কবিতা-ভাবনার বিস্মৃতি ঘটে। অস্পষ্টতা—রহস্যময়তার নিবিড় আলাপনের স্নিগ্ধ উচ্চারণে আত্মগতবোধ বিদীর্ণ করতে চায় abstract কে visual করার ইচ্ছায় ঃ 'কে বলে, রয়েছে স্থির রেখার বন্ধনে/নিস্তব্ধ ক্রন্দনে ?/মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি/এই নদী/হারাত তরঙ্গবেগ,/এই মেঘ/মূর্ছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন' [ছবি ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]।

আধুনিক যুগ-জীবনের অসহায়তার কথা, পদে পদে জীবনের জটিল জিজ্ঞাসা জীবনানন্দের কাব্যে ব্যঞ্জিত হোয়েছে অন্তর প্রতীম ঘোষণায় ; যে আত্মঘোষণার 'ভিতর ও বাহির' বেদনার বর্ণমালায় ক্রমায়ত সাজানো ; যে বেদনার প্রোথিত গভীরে ব্যথিত মৃগদের কথা ভেবে নিমজ্জিত হোতে গেলে আমাদের আবেগ প্রবণতা বিদ্ধ হোতে চায় পীড়িত বোধের কাছে এসে ঃ 'কেন এই মৃগেদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে/তাদের মতন নই আমিও কি ?/কোনো এক বসন্তের রাতে/আমাদেরও ডাকেনি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায় দখিনা বাতাসে/অই ঘাই হরিণীর মত ? [ক্যাম্পে ঃ জীবনানন্দ দাশ] —নগর সন্ধ্যার প্রান্তে ধোঁয়াটে মলিন রূপ এলিয়টের মননশীলতাকে আঘাত করেছে জীবন অনুভবের গভীরতায়। ফলে শব্দ এখানে চিত্র হয়ে উঠেছে ;—

'Home is where one starts From/As one grows older/The world he comes stranger,/the pattern more complicated/of dead and living. Nor the/intense moment/Isolated, with no before and after,/But a life time burning in/every moment/ And not the lifetime of one man only/But of old stones that cannot/be deciphered : [East Coker : T. S. Eliot]

Or,

'Poet's imagining /And memories of love ,/Memories of the words of women /All those things where of/Man makes a superhuman/Mirror—resembling dream.

[The Tower III : W. B. Yeats]

অতিক্রান্ত সময়ের মিলনকম্পিত অনুভব, জীবনের প্রতীয়মান অভিভাবনা, স্মৃতিপীড়িত ঘনায়মান আত্মবীক্ষা, দীর্ঘ অদর্শন—অনুপস্থিতির আর্তি, অসন্তোষ, অস্থিরতা নীরবতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে আকাঙ্ক্ষিত—অভিপ্রেতকে অন্ধকার থেকে আলোকিত উদ্ধারে রক্তিম করে তোলে দীর্ঘ কবিতার মূল প্রস্তাবনার পর্বে। পথ—পথপরিক্রমণ শেষে জীবন, জীবন জটিলতার ক্রমায়মান নঙর্থক পীড়ন সংশয়োদ্বেল চিত্তে এক বাঙ্ময় নীরবতাকে মন্দ্রিত করে তোলে নিহিত থেকে প্রকাশিতের আর্তিতে ঃ 'খুঁজেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে'—হৃদয়ের এই প্রান্তিক নির্জনতায় ক্লেশ-অক্লেশ-জনিত নিরভিমান দুঃখ, স্থূলসুখের প্রাকৃত উন্মোচনে 'বিপন্ন-বিস্ময়' যুক্ত বোধমালা অনুভূতির গ্রন্থিকে কখনো জ্যাযুক্ত, কখনো মুক্ত করে তোলে ক্রমবিবর্তমান মানসিকতায় মূর্ত থেকে বিমূর্তের আয়োজনে।

শিল্পের স্বভাব অভাব-অতৃপ্তিবোধের তাড়নায় নিত্য নতুন আঙ্গিকের সন্ধান করে ফেরে ভাবনার যথাযথ রূপায়নের প্রয়োজনে, শিল্পের অবয়বে কবিতার আকৃতি-প্রকৃতিগত দীর্ঘ-হ্রস্বতা মূর্ত হোতে চায় মূলতঃ মানসিকতার ক্রমঃবিবর্তমান পথ ধরে। উৎবেল—অনুৎবেল ভাবনা, শব্দের পর শব্দ পরম্পরায় ছবির মতো প্রযুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ জীবনের ঘটনাস্রোত অমল মান্দাসে ভাসতে দেখেছেন ঃ কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন-যৌবন ধনমান'—জীবনের এই তরঙ্গদোলাকে থরে বিথরে সাজিয়ে নিয়ে শূন্যতাকে পূর্ণ করে নেওয়ার কামনায়।

পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, যেতে নাহি দিব, মানস সুন্দরী, এবার ফিরাও মোরে, দেবতার গ্রাস, সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের পুরস্কার, বসুন্ধরা, পলাতকা গ্রন্থের ফাঁকি, নিষ্কৃতি, পুরবীর আহ্বান, পুনশ্চর ক্যামেলিয়া, সাধারণ মেয়ে প্রভৃতি কবিতা বয়নে দীর্ঘ, কাব্যিক গুণেও একটি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র, ঘটনাস্রোতে ভিন্ন, অথচ এই সমস্ত কবিতার অন্তর নিষ্কৃতি

কিন্তু একই জীবন অনুভবের মন্ত্রে দীক্ষিত। সমাসন্ন স্তব্ধতার প্রাক্কালে নতজানু ; কিংবা গোপন চরণ ফেলে 'শ্রাবণঘন গহন মোহে' যে তুমি নিশার মতো নীরব' হোয়ে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে 'এক অদ্বয় রৈখিক বিন্যাসে' সমুপস্থিত যার উপস্থিতি জ্ঞানময়তায় পরম করে তোলে অভিজ্ঞানের আলোয় —দীর্ঘ কবিতার স্ফুরণ ঘটে আত্মগত ভাবনার সেই উজ্জ্বল সমীপে ঃ

ক ॥

লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম, তাহারে ধরিল জরে
নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ-পরে।

অথবা ;

বিদীর্ণ হিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চারিদিকে চেয়ে দেখি,
প্রাচীরের কাছে এখনো যে আছে সেই আমগাছ একি !

এইসব দীর্ঘ কবিতায় ছবির পর ছবির মৃদু সংযুক্তিতে খটমান স্রোতোধারা হৃদয়ের অধিকারকে দীর্ণ করে নিয়মের স্বাভাবিকতা স্বপ্রতিষ্ঠ করেছে রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় ঃ

খ ॥

চলিতে চলিতে পথে হেরি দুই ধারে
শরতের শস্যক্ষেত্র নত শস্যভারে
রৌদ্র পোহাইছে।

কিংবা

.....চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে দুটি ছোটো হাতে
গরবিনি

গ ॥

.....ধর্ম জানে,
সেদিন চূর্ণিয়া গেল জন্মের মতন
জননীর শেষ গর্ব।

উল্লিখিত উদ্ধৃতি সমূহের চিত্ত উদ্বেজক নির্ভারতা, বিস্তৃত সরল গল্পধর্মী বর্ণনা বিন্যাস আমাদের 'সেন্টিমেণ্ট'কে যেন কোনো অকারণ মায়াবী

চাঞ্চল্যে বিধুর করে তোলে—ক্ষণিকের জন্যে ছড়ানো আকাশের বুকে যেন বিদ্যুতের আকস্মিক চমক। কিন্তু ঐ উদ্গত বিদ্যুৎ রেখায় রহস্যময়তায় নিমগ্ন হোলে আকস্মিকতার চমক শূন্যে মিলিয়ে যায় ; শুধুমাত্র স্মৃতিসুখ অনুভবের দোলার মানতা ছাড়া। রবীন্দ্রনাথের আয়তনে দীর্ঘ অধিকাংশ কবিতাই এই স্মৃতি সুখের আপাত চাঞ্চল্যে পূর্ণ। কিন্তু হৃদয় যুগোত্তীর্ণ কাব্যিক উৎকর্ষ, উদ্দীপনা, সংশয়জড়িত বিদীর্ণ আত্মার ক্রন্দন ও অন্তর্ভাবুকতার কুহক সৃষ্টির ব্যঞ্জনায় ততটা সপ্রতিভ নয়।

পালা বদলের উর্মিমুখর তরঙ্গাভিঘাত উনিশ শতকীয় কবি মানসিকতায় বিশ্ব-চেতনার ঐক্যানুসন্ধানের সূত্র আবিষ্কারে উন্মুখ মনে হয়েছিলো, যদিও বিষয়ঘনিষ্ঠতাই ছিলো এই ব্যাপ্ত শতাব্দীর মৌলপ্রশ্ন। ব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে সাধারণের জন্যে মন-উচাটনের প্রশ্ন এই বিশেষ সময়ের জলযানে তখনো আমন্ত্রিত ছিলো—বিষয়ের আত্মস্থতা এর প্রাথমিক কারণ।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতায় জীবন চারিতার ছন্দস্পন্দ অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ছড়ানো পঙ্‌ক্তি বিন্যাসের স্মৃতিসুখ অনুভবের মতই আমাদের চঞ্চলতাকে আন্দোলিত করে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের জীবন জিজ্ঞাসা দার্শনিক মনোভঙ্গি তাঁকে বৈচিত্র-বিশিষ্টতার মহান ঐতিহ্যের শরিক হোতে সাহচর্য দিলেও তা যতব্বেশী আবেগ ও গীতিমুখর পরবর্তী সময়ের কাছে ঠিক ততটা প্রভাব ব্যঞ্জক নয়—নয় গভীর মননশীলতায় পরিপূরিত। তবুও তাঁর মধ্যে সৃষ্টির যে দুর্মর ইচ্ছা বিভিন্নতার সমাবেশে পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল, অপ্রাচুর্যতাহেতু বায়রণে তাই শূন্যতার সৃষ্টি করল। শেলীর ভাবনায় 'true object of poetry'র সন্ধান এলো চরিতার্থ অচরিতার্থবোধের সংযুক্তিতে। জীবন বলতে তিনি বুঝলেন ঃ

Life, like a dome of many coloured glass,
Stains the white radiance of eternity.

জীবন ও কাব্যের এক জীবন্ত উপমা ওয়ার্ডসওয়ার্থের দীর্ঘ কাব্য The Prelude, The Recluse, অথবা Views on Man, Nature & Societyতে যা ছিল মূলতঃ দার্শনিক জিজ্ঞাসার সমগোত্রীয়, Prelude-এ তাই হয়ে উঠল জীবন স্মৃতির বৈচিত্র্যময় অভিভাবনা—যা এই দীর্ঘ কাব্যের ইতিহাস রচনা করেছে ; ১৭৯৮ থেকে ১৮০৫ সালের আত্মজীবনীর এই অংশ। আত্মস্মৃতিও যে রচনানৈপুণ্যে উৎকৃষ্ট কাব্য হতে পারে Prelude

তারই দৃষ্টান্ত।

আত্মজীবনীর আবেগময় খসড়া কাব্যে বর্ণিত হতে পারার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার দৃষ্টান্ত কোনো সাহিত্যেই তেমন ব্যাপক নয়। যে কোনো মহৎ শিল্পীর আত্মস্মৃতি সাহিত্য গবেষণার প্রাণময় উপাদান। কিন্তু এই আত্মস্মৃতি রচনার বিষয় অনেক কারণেই শিল্পীর বিস্মৃত মানস থেকে উদ্ধার করা দুরূহ হয়ে পড়ে, যদি না শিল্পী তাঁর ব্যক্তিগত উৎসাহে এ কাজে লিপ্ত হন।

'প্রিলিউড' আত্মজীবনী। বিশেষ অর্থে ছন্দোবন্ধ দীর্ঘকাব্য যা আমাদের মহার্ঘ ঋণে ঋণী করে রেখেছে—এই কাব্য ভাবনার বয়নের দীর্ঘ সিঁড়ি একের পর এক অতিক্রম করতে করতে তিনি পৌঁছে গেছেন গীতিময়তা থেকে বাস্তবতার শেষ সিঁড়িতে মানুষ মানবতা, উদার উন্মুক্ত প্রকৃতি থেকে মানব প্রকৃতির গভীরতায়—আবার ১৮১৩য় লেখা Excursion-এর রূপে নির্মাণ অনেকটা ব্যক্তি বিশেষের ঔজ্জ্বল্যে সমর্পিত; যার অন্তর্গত বিন্যাস শেলীকে প্রভাবিত করেছিল মনে হয়। শেলী এই কাব্যিক প্রভাবের উষ্ণ অনুরাগ পরিত্যাগ করতে না পারায় তাঁর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি Alastor-এর মত দীর্ঘ কবিতা। প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৬য়। কীটসের Pure and tender-heart ও উচ্চকিত হয়েছিল শেলীর Alastor পাঠে। যারই মন্ত্রসিদ্ধি ঘটলো তাঁর প্রথম দীর্ঘ কাব্য Endymion-এ যার আত্ম প্রকাশ ঘটল ১৮১৭ সালের বসন্ত ঋতুতে।

এই বিশেষ সময়ের কবি মানসিকতার প্রবণতা যেহেতু গীতিকাব্যের উদ্দামতায় ঘূর্ণমান ছিল, তাই দীর্ঘ কবিতার সম্ভাব্য সফলতা গীতিপ্রবণ মন ও গহ্বিবরে মনোভাবের কাছে সহজেই সমর্পিত মনে হলো। ক্যাম্বেল-এর দীর্ঘ কবিতাও দীর্ঘ কবিতার স্বনির্ভর উচ্চারণের পরিপন্থী হলো না, তাঁর স্বকীয়তা ঐ গীতিময়তার সপ্রাণতার মধ্যে নিহিত ছিল। গীতিকাব্যের মূল সুর যেহেতু অন্তর্মুখী প্রবহমানতায় স্পন্দিত, তাই জনারণ্যের ভীড়, জনমানসের বিবিধ মূর্ত অমূর্ত ক্রিয়াবিধি ঘটনা বিন্যাস এই কাব্যের ছন্দস্পন্দে অনুরণিত হতে পারল না, স্মৃতিভারে নত পারিপার্শ্বিকতার প্রক্ষেপ তাই মানসিকতায় প্রতিভাত হলো: 'Like something fashioned in a dreame' কিংবা 'The Fragrance breathing of humanity'? অথবা 'Will no one tell me what

she sings? স্মৃতির কাছে সমর্পিত এইসব স্মৃতিবাহী স্খলিত চরণের নিহিত ছায়ায় শীত রাত্রির যে প্রার্থনা ঘোষিত হয়েছে তা নিতান্তই কবির অন্তর্মুখীন বসন্তের উত্তরের সমাপ্তিব্যঞ্জক আর্তিতে পূরিত মনে হয়েছে; তাই দীর্ঘ কবিতার অসম্ভাব্যতা প্রসঙ্গে সেদিনের সেই দীপ্ত ঘোষণা: The long poem is not merely difficult, it is impossible It is dead, and should be publicly buried, and there is not the least occasion to mourn it...the long poem is an offence to art'

শিল্পের নব নব রূপ ও আঙ্গিকের মিলনে আমাদের অভিজ্ঞতা পূর্বার্জ ধারণাকে ম্লান করে দিয়ে চেতন অবচেতনের মধ্যে উদ্গত প্রাণ 'মৃণালিনী ঘোষাল'-এর নীরবতাকে অবচেতনের অন্ধকারে আলোকিত লক্ষ্য করেছেন ম্লান নীল জ্যোৎস্নার আলো/এইখানে/এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব/ভাসিতেছে চিরদিন; নীল লাল রূপালি নীরব'। এই নীরবতার নিমীলিত অন্ধকারে আমাদের যাত্রা; শৈল্পিক অন্বেষার মন্দ্রিত কলরবে আমাদের আকুলতা নিয়ত ব্যাপিত হচ্ছে শ্রবণসুভগকে দৃশ্যময় করতে; দৃশ্যময়কে উজ্জ্বলতর করে তুলতে এই দৃশ্যমান মায়াবী টেবিলে।

[ক্রমশ]

সুশীল সেনগুপ্ত

নজরুলের বিদ্রোহ ও তার স্বরূপ

১৯২২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা রচনার পূর্বেই নজরুলের বহু বিতর্কিত ও আলোচিত 'বিদ্রোহী' [১৯২১ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে রচিত এবং ৬ই জানুয়ারী 'বিজলী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত] কবিতাটি রচিত হয়েছিল। স্মরণ করা যেতে পারে যে, 'অগ্নিবীণা'র বহু কবিতাই ১৯২০ সালে রচিত হয়েছিল। সুতরাং সঙ্গত কারণেই মনে করা যায় যে, তদানীন্তন ইংরেজ সরকার বহু পূর্ব থেকেই নজরুলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি ইংরেজ সরকারের বাঞ্ছিত সুযোগ সৃষ্টি করেছিল মাত্র।

নজরুলের নামের পূর্বে যে বিদ্রোহী অভিধা যুক্ত হয়েছে তাহার মূলে 'বিদ্রোহী' কবিতাটির অবদান সর্বাধিক। জানা গেছে প্রথম সাক্ষাৎকারে নজরুলের কণ্ঠে কবিতাটির আবৃত্তি শুনে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে কবিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছিলেন। এই সুযোগে একটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। মনন ও মানসিকতায় নতুন যুগের কবিদের সঙ্গে নিজের দুস্তর ব্যবধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও যোগ্য উত্তরসূরীদের প্রতি ঔদার্যপূর্ণ প্রশংসাপত্র দিতে রবীন্দ্রনাথ কখনও কুণ্ঠিত ছিলেন না। এবং অত্যন্ত সুখের কথা যে উত্তরসূরীরাও অনুরূপভাবে প্রবীণ প্রধান কবিগুরুর প্রতি সশ্রদ্ধ অভিবাদনে কখনো পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাই বাংলা কবিতার রবীন্দ্র-উত্তরণ-পর্ব সুযোগ্য সন্তানের পিতৃঋণ অস্বীকারের কলঙ্কে শাপগ্রস্ত হয়নি।

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক যুগের তিন কবিই মূলত বিদ্রোহী, এবং এই তিন জনের বিদ্রোহের মূলে আছে বাস্তব মানবপ্রীতি। মোহিতলালের ক্ষেত্রে তা প্রধানত সুস্থ কল্যাণকর দেহারতি বন্দনায় মুখর করেছে—কোথাও কোথাও কবির আত্মাকে সচেতন বিদ্রোহের বহ্নিচ্ছটায় উদ্ভাসিত করেছে।

আর যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ কৌতুক-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তির্যক আলোকে সমুদ্ভাসিত। কিন্তু নজরুলের ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহ ব্যক্তিজীবনের নানা অভিজ্ঞতার কঠিন স্পর্শে খুব সচেতনভাবেই সমাজভিত্তিক হয়ে উঠেছে। সেইজন্যই মনে হয় 'আমি'র সঙ্গে খানিকটা ভাবৈক্য থাকলেও কবির অনুভূতির মগ্ন চৈতন্যলোকের সৃজন পরশে স্বতন্ত্র রসসত্তায় উত্তীর্ণ। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা তাই প্রত্যয়লব্ধ সত্যানুভূতির স্বগতোক্তি। এই কবিতায় কবি বলছেন ঃ আমি মুক্ত আমি সত্য, আমি বীর বিদ্রোহী সৈন্য/ আমি ধন্য ! আমি ধন্য ! এই কবিতারই অন্যত্র কবি বলেছেন ঃ……আমি গোপনপ্রিয়ার চকিত চাহনী, ছল করে-দেখা অনুক্ষণ/আমি চপল মেয়ের ভালবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কনকন্। যারা এই বৈপরীত্যের মধ্যে রসাভাসের দুর্লক্ষণ আবিষ্কার কিম্বা কবির বিদ্রোহী-সত্তার অপমৃত্যু লক্ষ্য করেন, তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় যে আলঙ্কারিকদের মধ্যে রস নিষ্পত্তিতে সঞ্চারীভাব নিষিদ্ধ তো নয়ই, বরং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ! এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বলা যেতে পারে যে বাস্তব জীবনের বাস্তিক ও সামাজিক মূল্য-বোধগুলির অবমূল্যায়ণ কোন সৎ বিদ্রোহীর কাম্য হতে পারে না ; আর কেবল অহমিকা বা সস্তা উন্মাদনা প্রচারই বিদ্রোহী কবিতার কোন কথা নয়—তার প্রমাণ ঃ মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত/আমি সেইদিন হবো শান্ত/যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না/অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না,/বিদ্রোহী রণক্লান্ত আমি সেইদিন হবো শান্ত !

আবার কবি যখন বলেন ঃ আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদচিহ্ন !/আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন ! !/আমি চির বিদ্রোহী বীর—/আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি চির উন্নত শির !—তখন নজরুলকে বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদে প্রাগ্রসর প্রগতিস্কন্ধ কবি বলে চিহ্নিত করা অসমীচীন নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ভারতীয় জনসমাজে পরাধীনতার গ্লানির সঙ্গে

---

(১) মোহিতলালের 'আমি' নামক একটি রচনার সঙ্গে কবিতাটির বিষয়-বস্তুর খানিকটা সাদৃশ্য থাকায় এককালে নজরুলের সঙ্গে মোহিতলালের এ নিয়ে বেশ কিছুটা মনকষাকষি হয়। তবে দুটি রচনার প্রেরণা, বক্তব্য এবং প্রকাশ সম্পূর্ণই আলাদা—এ বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

ভূম্যধিকারী ও শিল্পপতিদের সঙ্গে দুর্নিবার শোষণ নজরুলের মনে স্রষ্টার প্রতি যে নিদারুণ অভিমানাহত বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল তার ভিত্তিভূমিতে কবির বাস্তব-সমাজ-সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। বলাবাহুল্য অনুভূতি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আলোচ্য যুগের অপর দুই কবি সমাজ চৈতন্যের এতো তীক্ষ্ণতা প্রকাশ করতে পারেন নি। তাই 'শেষ সওগাত' গ্রন্থের 'চিরবিদ্রোহী' কবিতায় কবিকে বলতে শুনি: বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান/তোমার ধরার দুঃখ কেন :/আমায় নিত্য কাঁদায় হেন? অনেক বিশৃংখল সৃষ্টি তোমার, তাই তো কাঁদে আমার প্রাণ/বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান! বিদ্রোহী কবিতায় কবির শান্ত হবার যে শর্ত ছিল সেই অবিচল শর্তটি তিনি স্রষ্টার সামনে তুলে ধরেছেন; বিদ্রোহ মোর আসবে কিসে/ভুবন ভরা দুঃখ শোক!/আমার কাছে শান্তি চায়/লুটিয়ে পড়ে আমার গায়/শান্ত হবো আগে তারা সর্বদুঃখ মুক্ত হোক্।

শৃংখলিত অত্যাচারিত শোষিত মানুষের 'সর্বদুঃখ মুক্তি' বাসনাই নজরুল কাব্যের প্রধান সুর। এই মুক্তি সংগ্রাম বাসনাই একদিকে কবিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং অপরদিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাবিরোধী সাম্যবাদ প্রত্যয়নিষ্ঠ আপোসহীন কবি-সৈনিকে পরিণত করেছে।

এই সূত্রেই বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্পর্কের ইতিহাসে নজরুল এক বিশিষ্ট নাম। ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২—৫৯), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৮২৭—৮৭), মধুসূদন (১৮২৪—৭৩), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩), নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১)—নজরুলের পূর্ববর্তী ও সমকালীন এই কবিদের দেশাত্মবোধক রচনাগুলির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও অসঙ্কোচে বলা যায় যে স্বাধীনতাকামী জনগণের সংগ্রামী চেতনার বাস্তব রূপায়ণের সঙ্গে তাদের যোগসূত্র প্রত্যক্ষ এবং গভীর নয়। এমন কি ঐ যুগের নাটক ও উপন্যাস সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় অনেকটাই 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'।

——

• কবিতা

হরপ্রসাদ মিত্র

রাধা

গাধাগুলো সব হাঁটছিল চুপচাপ,
ঠেলাগাড়িটার গাড়োয়ান ছিল তিন;
সজনে-ফুলেরা হাসছিল—সে কি হাসি?
শিমুলের কুঁড়ি ন্যাড়া শাখা-প্রশাখায়
খুব উঁচু হয়ে খুব সুখী হোলো কি না—
জানি না তা, জানি না তা।

কাকে বলে জানা? জানতে জানতে যেন
নদীতে ঢেউয়েরা কেবলি উঠছে ফুটে;
কাঠবিড়ালীরা কেবলি চলছে ছুটে
মুকুলিত আমগাছটা লক্ষ্যে রেখে।।

দেহ-মন ছাড়া পরমাত্মার মানে
শুনেছি কথনো সুফী-বাউলের গানে;
আমি সেই সুর শিখলে কী হোতো, সে তো
বোঝাই গেল না; সব বোঝবার নয়।
যেটুকু আমার, সেটুকুই দুর্জয়।।

খুব চড়া সুরে খুবই সোজা কথা বলা
সে বাক্‌ভঙ্গি বস্তুত নিষ্ফলা।
তাই তো আমার স্বভাবোক্তিই সাধা
কবিতা আমার গহন মনের রাধা।।

রূপসীর শব

আমি এক অলীক ইচ্ছে নিয়ে এখানে বসে আছি
ছায়াহীন তমালের নিচে, আমার চতুস্পার্শে
পাহারারত তীক্ষ্ণ চোখগুলো শানানো
ছুরির মতো হিরণ্ময়।

হে আমার অলীক ইচ্ছে
অবিশ্বাস্য স্বপ্নের বিন্যাসে সমর্পিত চাঁদ
কি উজ্জ্বল তোমার শরীর
ছায়াচ্ছন্ন আঁধারে জেবলে রাখছো স্বর্ণালি পালক।
নব উত্থিত শাখায় ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছো
আলোর সান্নিধ্যে বেড়ে যাচ্ছো
নির্বোধ কুহকিনী।
পায়ের নূপুর বাজিয়ে যাচ্ছো
বাতাসে উড়িয়ে ছিন্ন কুন্তল।
হে কামিনী গুল্ম দেহে বেড়ে দেবো
নগ্ন আঙ্গুল খুঁজবো কামকলা
রক্তের ময়ূরী নৃত্যে লতানো জিহ্বায়
ঝরাবো কামুক আগুন
তীক্ষ্ণ দাঁতে ছিঁড়বো কলংকিত নিশি
পত্রময় বুকে জড়াবো স্তনবৃন্তকা,
তোমার কলস্বরা শরীর।
বাহুতে সাইক্লোন হবে পুনর্বার
নেচে উঠবে রক্তের প্রপাত
মৈথুনবিহীন রূপসীর নগ্ন শব
ভাসবে রক্তের বুদবুদে পুনর্বার।

এক সাথে এতো ফুল কখনো ঝরতে দেখিনি

প্রলয়ংকর ঝড়ের রাতে ভিজে ভিজে আমরাও এখন
অনেক দূর এসে গেছি
চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কত সাহসী ফুল
এক সাথে এতো ফুল আমি কখনো ঝরতে দেখিনি
ভিয়েৎনামের আশ্চর্য মাটিতে এমন ফুল প্রতিদিন ঝরে পড়ছে
আবার ফুটছে—আবার ফুটছে

এমন পবিত্র ফুলের বুকে পা রেখে আমরা কি ফিরে যেতে পারি

কিংবা ভুল পথে পায়ে পায়ে রক্ত মেখে বেশী দূর এগোতে পারি!

ভাঙ্গা শংখের বিবর্ণ আর্তনাদ
বুকে চেপে অপেক্ষায় আছে যে দময়ন্তী
তাকে তুমি কি কৈফিয়েৎ দেবে
আমিই বা কি কৈফিয়েৎ দি
দেখছো না কত ফুল—কত পবিত্র ফুল পড়ে আছে

বরং এসো কৃষ্ণচূড়া-ছায়ায় বসে আমরা স্বীকার করি
আমরা বুঝতে পারিনি বোকা বুড়োর গভীর চালাকি
আমরা যোয়ানেরা রাতারাতি চার পাহাড় সরাতে গিয়ে
কী ভীষণ আহত হয়েছি!

এখন পবিত্র ফুলের বুকে পা রেখে আমরা কি বাড়ী ফিরে যাবো
অথচ ভুল পথে পায়ে পায়ে রক্ত মেখে কোথায় এগোবো!

বেলা দীর্ঘ হলে—ছায়া দীর্ঘতর হয়
এখন ঝড়ের রাত—ভ্রান্তিবিলাসের নয়
এসো পবিত্র ফুলের ঘ্রাণ মেখে নিই শরীরে শরীরে

তারপর
এক নব-স্থপতিরে ডেকে এনে
অন্ধকারে ঝরে পড়া প্রিয়া-চাঁদটারে
আবার বসিয়ে দি
ঐ
পুবের পাহাড়ে !

জগন্নাথ বিশ্বাস

বাঘ

মাঘের দুরন্ত শীত।
টিপটাপ পাতায় শিশির,
কুয়াশায় ভারী রাত
চিরে চিরে ফেউ-এর চীৎকার,
মন্থর বাঘের থাবা
কাশবনে রোমশ গম্ভীর।

হঠাৎ গোয়ালঘরে ঝটপট শব্দ উঠলো,
ঘুমন্ত গরুরা যেন এক সঙ্গে জেগে উঠেছে,
তাদের ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ…
যথাসম্ভব চেপে চেপে
এক সঙ্গে গা ঘেঁসে দাঁড়ালো তারা
কোনো এক ভয়াল আক্রমণ প্রতিরোধের প্রতীক্ষা করে ;
তাদেরই খুরের শব্দ,
তাদেরই আশংকার নিঃশ্বাস
আর তাদেরই উত্তপ্ত বিচালির খস্‌খসানির তলে তলে
পাওয়া গেলো
ভারবহ লঘুসঞ্চারী চারখানা থাবার আভাস।

অতি নিঃশব্দে
কম্বলের গরম থেকে বেরিয়ে আসি,
আরো নিঃশব্দ হাতে দরজা খুলে বাইরে দাঁড়াই।
শীতের সমুদ্র যেন মুহূর্তে সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তুললো,
লণ্ঠনের আলোয় নিজেরই বিরাট ছায়া
ভূতের মতো দুলে দুলে উঠলো কুয়াশার বুকে,
পিটুলি গাছটার ডালপালা ছেড়ে বেরিয়ে গেলো
একখণ্ড নিশাচর বাদুড়,
আর সেই চরম মুহূর্তে—
রোদেপোড়া টিনের চাল কুঁকড়ে উঠে
বিকট আর্তনাদে ফেটে পড়লো যেই,—
সঙ্গে সঙ্গে শীর্ণা কালজানি ওপারে
বজ্রনির্ঘোষে বাঘের আওয়াজ…
কোনো এক হরিণের জীবনান্তের কালান্তক আহ্বান।

ভয় ভয়
সমস্ত সত্তায় আজ নিশিরাত্রির আচ্ছন্নতা
রাত্রির ঠাণ্ডা ভিজে কুয়াশা-চাদরের নিচে
চক্‌চক্‌ হুঁশিয়ারি আহারের শব্দ
ব্রাউন-শাদা মুখে ও থাবায় গরম রক্তের ছোপ
শরীরে কি অপরূপ মসৃণ জৌলুস !

এখন কালজামির তুষার-হাওয়া উঠলো
এখন জুটলো আবার স্তব্ধতার পাহাড়গুলো
ছায়াঘন। বাঘ। বাঘের ঘড়ঘড় আহ্বান।
বাঘের মূর্তিমান নিশাচর ভয়।
এখন নিশ্চিন্ত। ও শিকার করবে শুধু
পাকস্থলীটিরই ন্যূনতম দাবি মেটাতে,
অহেতুক উল্লাসে বা ঈর্ষায় নয়।

কৃষ্ণ ধর

সেই গোধূলিতে একা

এক ঝাঁক বালিহাঁস ঝরাৎ ঝরাৎ শব্দ করে
উড়ে গেল গোধূলির দিকে
কোপাইয়ের শীর্ণ জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে
সেই রক্তাভ আকাশটাকে দেখলুম।

স্তব্ধতা আমাকে যেন গ্রাস করে নিল
তার বুকের ভিতরে।
উড়ছে বীরভূমের লাল ধুলো
আমার চোখেমুখে এসে পড়ছিল
সেই সন্ধ্যাকে খোয়াইয়ের ধারে
এমন করে পাব কে জানত ;
আমার সঙ্গ আমার নিঃসঙ্গতা
আমার অবিরল বিষাদ
সব একে একে ঢেকে দেয়
আমি কিছুই খুঁজে পাই না
অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সেই
ধুলোমাখা সন্ধ্যায় ফিরে এলুম শ্রীনিকেতনে।

প্রণব মাইতি

জীবনের নাম রাজবরণ

কক্ষনো কিছু বলব না আগে থেকে
জামা কাপড়ের আবরণ রাখবো না
যেহেতু জীবন কমনীয় রুক্ষতা
হাতের রেখায় কমনীয় সুস্থতা
কখনো কোথাও অনুযোগ তুলব না
এভাবেই দিন কাটুক না একে একে

প্রজাপতিদের পাখনায় কারুকাজ
রাজবরণের শরীরে অগাধ কাঁটা
কমনীয়তায় রুক্ষতা বোধে সুখ
জীবনের মানে কে বুঝেছে দুমুখ
স্রোতের ভেতরে কোথাও জোয়ার ভাঁটা
ছেঁড়া মখমলে জড়ানো রাজার সাজ।

সুশীল রায়

শস্য

ধরতে এসেছি মাছ—
হাতে ছিল না ছিপ,
বড়শীও ছিল না সুতরাং।

জলায় ছায়া পড়েছে অগাধ
প্রকাণ্ড এক আকাশের।
জলে মেঘের ছায়া ভাসছে
নড়ে উঠছে ফাতনা, সরে যাচ্ছে মেঘ।

পড়শী মাতঙ্গিনী দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে
তার শরীরের ছায়া জলার কিনারে
ছলাৎ-ছলাৎ করছে।

কিসের এই হাসি ?
হাসি আবার কিসের !
ছিপ কোথায় ? কোথায় ফাতনা ?
মাথা নেই তার মাথাব্যথা।
ধরা পড়বে রুই-কাৎলা
মৃগেল, বা নিদেনপক্ষে কই ?
কই ? তাকালাম চারদিকে—
বেঁকে দাঁড়াল সে। দেখতে হল বড়শী।
বলতে পারিনি, পেয়ে গেছি আমার মৎস্য।
গোলা-ভরতি হয়ে গেছে শস্যে।

শুক্লা দে

বিশ্বাস

সামনে ডাক পেছনে বিদায়
পেছনে ডাক সামনে বিদায়
বীজের বুকে অঙ্কুরের প্রাণান্ত দোলন
এ পাড়ায় বৃষ্টি—অনেকদিন স্নানের মত ঝিলমিলিয়ে ওঠে

চুপ করে বসে থাকলেই
আলমারিটা আপনি খুলে যায়
ডাইরী ডাইরী ডাইরী
অ্যালবাম অ্যালবাম অ্যালবাম
একদিন সবশুদ্ধ বিক্রি করবো নিলামে
ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে
জানি তোমার হাতেই দাঁড়াবে গিয়ে সব

অতীন্দ্রিয় পাঠক

এখন সমুদ্র

উজ্জ্বল সকাল চাই—নীল প্রার্থনার মতো এই নীরব বাসনা হোক।
সমুদ্রের কোন কোণা থেকে শব্দ ভেসে আসে জল নেমে আসে
উজ্জ্বল সকাল হোক সেই পূবকোণ
শব্দগুলি পরস্পর ছড়াতে থাক ছড়িয়ে যেতে থাক বল্গা টান রেখে
আলোগুলি সমর্পিত প্রসারণে প্রসারণে দীর্ঘ পথ ধরে
এখনো স্রোতের মালা কম্পমান ছত্রাকার সবুজ ধূসর।

আমাকে নিঃসঙ্গ রেখে ওরা যারা দূরে সরে থাকে
সহজ দূরত্ব রাখে সেইসব গোপনচারীরা
এই যে সমূহ গাছ হাওয়ায় কি বেদনা নিত্য ঢেলে দেয়
সমুদ্র সামনে থাক আমরা এখানে—দীর্ঘদেহ উর্ধ্বমুখ
উচ্চারণ উচ্চারণ—এরাও নিঃসঙ্গ!

ওরা সাতজন সমুদ্র থেকে উঠে আসছে ওরা সাতজন
চিৎকার করে বলছে—শ্যামল—তবে পৌঁছে দিলাম
এই দ্যাখ তোর কাছে সমুদ্রের ডাক।
মুখ ফিরিয়ে আমি এইমাত্র পৃথিবী থেকে দূরে
কাঁচের দেয়াল ঘেরা স্ফটিকের মালা দেখে চিৎকার করি—
এইবার আমি দেয়ালটা ভেঙে সমুদ্র পেছনে রেখে
স্ফটিকের মালাগুলো চুরমার করে দিয়ে সটান তোমার
বুকের ওপর দিয়ে দেখো তুমি ঠিকঠাক হেঁটে চলে যাবো।

অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়

বেদনা

প্রশ্ন প্রশ্নই থাকে উত্তর নেই
তবুও আমরা তার হারানো ডানাটি ধ'রে
চক্‌মকি পাথরের যুবকের মতো
উত্তর পেতে চাই একান্ত ডেরায়।

বলো, কালীঘাটে পুজো দিয়ে ফিরে
তোমার প্রশান্ত মুখে কেন ওরা বলে
ঘরেতে বাড়ন্ত চাল, রেশন বন্ধ
আমার ছুরিতে কেন মরচে ধরেছে।

জানি, এসব প্রশ্ন তার একুশে—বাইশে;
তিরিশে কোথায় যেন নিঃসঙ্গ যুবক
দোকান বন্ধ ক'রে আগুন জ্বালালো
ঘড়িতে তখন বাজে রাত আটটা।

তবুও প্রশ্ন ফেরে উত্তর নির্খোজ
বলো, জন্মক্ষণ শোধ দিতে গিয়ে
কবেই বা পাখি হয়ে উড়ে যাব ডালে
কবিতার জন্ম দেব জীবনকে দিয়ে।

কবে তুমি আসছ, ভ্রমর

ভ্রমর, আমার ভ্রমর
কবে তুমি আসবে ?
স্বপ্নে ডোবা ওই দু'চোখ ছাড়া
কিছু-ই মনে পড়ে না যে !
দ্যাখো না—
কি সুখে আছি !
(একবার অনন্ত দেখে যেও ।)

পুরনো সব সুখ পাবার লোভে
রোজকার দুঃখ ভুলে
অনুগত মন নিয়ে বেঁচে থাকা । আর কি !
তবু দ্যাখো ভ্রমর,
পথ আগলে খুশিমতো মূর্তিপুজোয় উল্লাস,
লোক দেখিয়ে ভক্তির জল আছড়ানো ।

তুমি, তোমরা এ হাত দেখে আদর ক'রে
এরকম বলতে—
আমি বড় হব, আরও অনেক বড় ।
বড় হতে পারিনি তবু—
সামনে, পেছনে—আমার চোখের দিকে
ঘুরে ঘুরে অন্ধকারের বেড়া আঁকা ।
পায়ে পায়ে জড়িয়ে সাংঘাতিক কি অন্ধকার !
(ঠিক পাহাড়ী অন্ধকার ছুটছে সমানে ।)

ইচ্ছে নয়, খাড়া করা ছুরি দিয়ে
হাত শুধু নির্মূল করি ।
ভ্রমর, আমার ভ্রমর
কবে তুমি আবার আসছ ?
আমার বুকে এখনও ব্যথা—প্রচণ্ড ব্যথা যে !

ফুটপাতের মৃত শিশু

সাড়ে তিন হাত মানুষটুকু দাঁড়িয়ে উঠলো যেই,
দেহাত আকাট
তিন বছরের লাশেরই সামনেই ।
কেঁপে উঠলো ঝড়,
তার শিরায় শিরায় মরণ নাচে, এ কোন্ বর্বর
চোখের পাতায় জল নেইকো
শুধু আগুন মিশে
শিখা হয়ে উঠলো নেচে এই ফাগুনের শেষে ।

তার বুকে ছিল রক্তজবা ফুটে উঠলো দেহে,
বাছা তখন লেপ্টে আছে সাড়ে তিন হাত স্নেহে,
স্নেহ ? নাকি আগুন-ভেজা নীরব ইস্তাহার
ছড়িয়ে দিল—
ভদ্দরলোকের কোঁচার কল'কাতার
পায়ের কাছে ।
যখন নাচে কৃষ্ণচূড়ো শানবাঁধানো ঘরে
ফাগুন আসে মৌটুসীরই ঝাড়ে
খোঁপায় ওঠে যুঁই
যখন শহর তুমি আমি বুকে রেখে শুই । তখন

ভাতের গন্ধ বুকে নিয়ে বাছার এ কোন্ ঘুম,
বসন্তেরই ক'লকাতাতে
অশ্লীল, নিঃঝুম—
সাড়ে তিন হাত শরীর যেন আগুন হয়ে জ্বলে ।

মশাল হয়ে রৌদ্র এলো, কেঁপে উঠলো ঝড়,
দেহাত আকাট লাশ জড়িয়ে
এ কোন বর্বর,
চোখের পাতায় জল নেইকো
শুধু আগুন মিশে
শিখা হয়ে উঠলো নেচে এই ফাগুনের শেষে ।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

আমি রক্ত নিয়ে খেলছি

আর যখন সেই খুনের রক্তে লাল হাত, আমার শরীরে রেখে
খুনী বলেছিল, তোমার রক্তকে এই হাতের গন্ধে মেশাবো।
আমি সময় চেয়ে চেয়ে তখন থেকেই পালিয়ে বেড়াচ্ছি।
পৃথিবীর তাবৎ সুন্দর ফুলের গাছ, সুন্দরী পাখির গান
বহু কষ্টে এই বুকে নিয়ে ভেবেছিলাম—খুনীর ঘরদোরে
চিলতে ভুঁইয়ে বাগান সাজাব।
(ফুল নাকি খুনীকে ফেরায়)
বল্মীক মাটি মাখিয়ে স্নান করাব আর ভেবেছিলাম,
গায়ত্রী জপ আওড়ে দিয়ে তাকে ফেরাব।

আর যখন সেই খুনের রক্তে লাল হাত আমার শরীরে রেখে
খুনী ধরে ফেলল আমাকে,
ফুলের গাছ, সুন্দরী পাখি বল্মীক মাটির আকর উপহার দিতে গিয়ে
তার হাতে কেবলই লাশ তুলে দিচ্ছি—
আসলে কখন থেকে নিজের অজান্তেই আমার মধ্যেই খুনী
ফিরছিল, কতভাবে কত চাতুরিতে আমার রক্তের গন্ধে
খুনীর হাত ভিজে গিয়েছিল।

আর তখন মনে পড়ে গিয়েছিল, পৃথিবীর তাবৎ সুন্দর ফুল
আমি চোখেও দেখিনি, সুন্দরী পাখির গানের সুরে
নেচে ওঠা সময়, ছিল না কখনো আমার।
বল্মীক মাটিতেও ছিল আগুন ;

খুনীর মুখোমুখি আমি রক্ত নিয়ে খেলছি
লাশের রক্ত কি এত শীতল ?

তপনকুমার ঘোষ

পশ্চিমের জাহাজ

আমরা সমতলভূমির মানুষেরা
একটি পাথর বয়ে নিয়ে যাচ্ছি
পাহাড়টার ঠিকঠাক চূড়োর কাছাকাছি।
শোনা গেছে—
মানুষের বাসস্থান হবে

আমাদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী-গুণী ছিলেন
তাঁদের কেউ কেউ বললেন—
আহা কী সুন্দর হবে আমাদের বাসস্থান
পাপি কিম্বা ডালিয়া নয়
তেজী গন্ধরাজ আর বকুলের সৌরভে
মাখামাখি হয়ে থাকবে উদ্যানের বিলোল বাতাস।

হেঁইয়ো রে হেঁইয়া, হেঁইয়ো রে হেঁইয়া
সমস্বরে গেয়ে উঠলেন তাঁরা।
আমরা কাঁধে তুললুম পাথরটিকে।

তারপর এক সময় পাথরই রুখে দাঁড়ালো পথ,

এ ওর হাত ধরে আমরা থমকে দাঁড়ালুম
আর তাঁরা দূরবীণ চোখে এঁটে দেখতে লাগলেন
পশ্চিমের জাহাজ।

বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার বিষয়টা

এখানে খুন খারাবির কথাই বেশী,
এখানে হানাহানি এবং কাটাকাটি,
কিছু সম্পত্তির ভুল হিসেব,
জমির আল নিয়ে গোলমাল।

দায়ের কোপে রক্তারক্তি, কুমারী মেয়ের গর্ভ,
ভ্রূণ হত্যার নালিশ,
ইজ্জত খোয়ানোর আর্ত চীৎকার।
মাঝে-মধ্যে ত্রস্ত মানুষ হাত জোড় করে দাঁড়ায়
'হুজুর বিচার চাই, ধর্মাবতার বিচার চাই'।

এমনি করেই দিন যায়,
দাঙ্গা-দখলের কথায় কথায় কান হাঁপিয়ে উঠে,
মুখ বুজে দুনিয়ার অভিযোগ শুনি,
আমার নিজের আর অভিযোগ করা হয় না।
দু বুক যৌবন নিয়ে যে আমার যৌবনটাকে
ফুঁসলে নিয়ে গেলো
তার বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনা হয় না।

শোভনকুমার সরকার

দীর্ঘ আত্মমগ্ন ছায়ায়

১
অনেকদিন কাউকে কোন চিঠি লিখিনি
ভীষণ হচ্ছে হয় কিন্তু ভাল লাগে না।
থাক, আজ নয়,
আরেক দিন লেখা যাবে বেশ বড় চিঠি।

হাতের কাছে দেরাজটা বহুদিন খোলা হয়নি
অনেক চিঠি, কিম্বা নানা পাণ্ডুলিপি, এবং
কোন ভাঙা কলম, আর কিছু টুকিটাকি
পেয়ে যেতে পারি।

থাক্ যেন বিস্মৃতি, কিম্বা বনবাসী,
অন্য একদিন তোমাদের নিয়ে খেলা করা যাবে।

২
মেয়েরা কিশোরী হলেই তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়
মেয়েরা এ বয়সেই আসল শিল্প, মনে হয়।
এবং শিল্প, তার মানে—খালি ভাঙ্গা আর গড়া,
এই যদি উপস্থিতি এই তার মুখ ফিরিয়ে যাওয়া।
এখনই কেবল এইসব মনে হওয়া, অলসতা, উল্টেপালে দেখা।

৩
বৃষ্টির শব্দ হয়ে এসব কথামালা কোথা থেকে আসে!
চকিতে, বিভ্রমে আঁকিবুঁকি ছায়া ধরা পড়ে—
এসব নিজের কথা নিজেকেই বলা, আমি অমল কিশোর
আরও একবার, এভাবে, অপরাহ্নের এই দীর্ঘ আত্মমগ্ন ছায়ায়।

৪
কে তুমি নূতন কিশোর, তোমাকে এসব বলা যায়।
শৈশব, কিশোরী-সাথী, চিঠি, কিছু দুরন্ত স্মৃতি ঃ
মৃত্যু বরাবর আমি তার ক্রীতদাস হয়ে গেছি।

অন্যমন দাশগুপ্ত

কে তাকে ফেরাবে

প্রতিরাত ঘুম ভেঙ্গে গেলে কি যেন হারাই
ফেরাতে পারি না তা,ক তার অনুভব
শুধু তাপ ছুটে আসে দুঃখের, তখন
কি থাকে করার কে তাকে ফেরাবে।
সূর্যাস্তের মত সেও অস্ত যায় তারপর
প্রতিরাত ঘুম ভেঙ্গে গেলে তাকে খুঁজি।
শ্মশান, দুঃখের ঘর, সবকিছু ফেলে রেখে
সে আমাকে নিয়ে যেত বিমল উঠোনো—
যেখানে অগোছাল আসবাবপত্রের মত
ভালবাসা ছড়ানো ছিটানো।

প্রতিরাত ঘুম ভেঙ্গে গেলে কি যেন হারাই
ফেরাতে পারি না তাকে তার অনুভব
তখন কি থাকে করার কে তাকে ফেরাবে।

রজত মিশ্র

তিনটে ট্যারা পদ্য

১ বৃষ্টি বৃষ্টি

সকাল থেকেই বৃষ্টি এলো : বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি
বুড়ো চশমা পরেও কেমন ঝাপসা লাগে দৃষ্টি
বৃষ্টি এখন দেয় না চোখে কদম কেশর রাত
বৃষ্টি দেখে আঁতকে ওঠে বাতশ্লেষ্মার ধাত ।।

২ প্রেম

বাসাংসি জীর্ণানি যথা আকৈশোর প্রেম
খসে পড়ে গেলে
এখনও নিখুঁত লক্ষ্যে বেঁধে বিষ
নিকষিত হেম ।।

৩ বয়স

অসতর্ক পেয়ে আমায়
খাচ্ছিস এখন খা
আমি রা-টি কাড়বো না।
এর পরেতে
ভেক ভেল্কি নিয়ে যখন
সাজবো জ্ঞানবৃদ্ধ
(বিদ্যে বুদ্ধি না)
আমার জড়িয়ে ধরিস পা ।।

প্রশান্ত রায়

রং নাম্বার

এরকমই হঠাৎ মনে পড়ে
মনে পড়ে
দু-জনের চোখের ভিতর কি এক আবদ্ধ সময়
পাথরের দৃঢ় স্মৃতি হয়ে
সময়-কোরক অঞ্জলী দেয় বার বার।
কিন্তু কেউ অপেক্ষায় থাকে না
পড়েও থাকে না গ্লানিট নির্মাণ
পরোয়া করে না কোন পরোয়ানা
তবু অজানাকে জানতে
জীবনে জীবন যোগ বা পরশ পেতে হয়,
সে সময়
সমস্ত দরোজায় রং নাম্বারটি ঝুলিয়ে রাখলে
বিশেষ নাম্বারটি পেতেই সময় চলে যায়।

কেউ থাকে না অপেক্ষায়
পড়েও থাকে না নির্মাণ
পরোয়া থাকে না কোন পরোয়ানায়
তবু অজানাকে জানতে
. রং নাম্বার-রং নাম্বার-হয়ে চলে যায়—

সমর মজুমদার

হরিশ্চন্দ্র

হরিশ্চন্দ্র মানবজাতি
মিলেছে শ্মশানে—
কংকালের মিছিলসহ
পাত্র হাতে নিরন্ন সম্ভারে।

হরিশ্চন্দ্র দণ্ড শোভে
পরিত্যক্ত ছিন্নবস্ত্র ;

মতের কণ্ঠে শুনি তাই—
'খাদ্য নাই, খাদ্য চাই।'

সহস্র শৈব্যাত্মা আজ
মানব হৃদয়।
বাষ্পাকুল ক্রন্দনবারি তার,
পুঞ্জিভূত মেঘ।

হরিশ্চন্দ্র বস্ত্রহীন,
নিরুত্তাপ বৈষ্ণব এবং
বধির, অন্ধ, জীবাত্মা—
অসহায়, নিরন্ন, স্থবির।

প্রবীণ সরকার

আমরা কী ?

আমরা নিজের জীবন্ত মাকে—
অভুক্ত—অতৃপ্ত রেখে
মন্দিরে পাথরের মাকে
'মা—মা' করে ডাকি।
মনকে চোখ ঠেরে
ভাবের ঘরে চুরি করে থাকি !
আমরা চোর !

আমরা ধার্মিকতার ভান করে'
মন্দিরে মন্দিরে মাথা ঠুকি।
নিজ নিজ চৌহদ্দিতে
স্বার্থের লোভী চক্‌মকি
জেবলে ক্ষতির আগুনে
পোড়াই অন্যের স্বার্থকে !
আমরা বক-ধার্মিক !

কার্তিক মোদক

কিশোরী

কতদিন দেখিনি তোমার মুখ, সবুজ নালিঘাস ভরে আছে
কয়েকটি বছর, ছিন্ন পাতায় উড়ে
হৃদয়, সায়াহ্ন যূথিকা,
অস্থিরতায় খুলে যায় আলতো খোঁপা
শীতের উত্তাপে দ্রুতচ্ছবি মেঘের ভেতর ছুটোছুটি করে,

মাঝে মাঝে এ রকম দুঃখ বড় বেশী স্পর্শে, অনুভব হয়, তুমি আছো ?
তাই এত ক্রুদ্ধ, এত বেশী একলা হয়ে পড়ি,
এত বেশী দূরগামী শব্দ শুনি
এত দুঃখ নিয়ে দাপাদাপি করি

কেউ জানে না প্রবাসে কি ভাবে কাটাই দিন, এলোমেলো ছন্নবেশী
গোপন জানলায় এসে রোজ খোঁজ করি চিঠি,
কানায় কানায় ভরে যায় রোদ, শেষ দেশ ভীষণ শ্যাওলা
বাগানের হাওয়ায় কেঁপে উঠে টাউন হলের কবিতা ভবন
বিপন্ন বিস্ময়ে পাহাড়ের মত মুখ তুলে
চেয়ে থাকি—শবধার
কিশোরী ;
ভিক্ষুকের মত চেয়ে থাকি, তারপর বসি দু'জনে মুখোমুখি

কার্তিক মিত্র

শ্মশানে মাঝরাতে কাক

আমাকেও একদিন শুতে হবে এই সৌন্দর্যের মাঝে

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস ছুঁয়ে যায়
চুল, ত্বক, কণ্ঠ, শোণিত, সচল হৃৎপিণ্ড।
তবু কী অসীম করুণায়
শিশিরের সাথে মিশে নক্ষত্রের তাপ ঝরে।

জ্যোৎস্নায় নিমগাছে দুটি কাক নিঃসঙ্গ একাকী
ডানার শিশির ঝেড়ে ঝুড়ে
আচমকা দারুণ আহ্লাদে ডেকে ওঠে,—
এখনো ভোরের বহু বাকী।
সৌন্দর্যের বোধ তারও আছে কী!

যে কেউ এখানে এসে দেখে যাক্
কলকল ঢেউগুলো ছোটে
নিজেকে হারাতে সমুদ্র উল্লাসে,—
শিশির কেমন করে ঝরে
চিরস্তব্ধ মানুষের গায়ে,—
শ্মশান কুকুর উদার আকাশপানে মুখ তুলে
কেমন করুণ সুরে কাঁদে—
বিশাল হবার টান তার ধমণীতে।

যে বিদায় নিয়ে চলে গেছে,
যাকে বিদায় দিতে আনা হয়,
যে কোন বিষণ্ণ নদীচরে—
সেখানে কাকেরও হৃদয় নাচে
জ্যোৎস্নায়, জ্যোৎস্নার স্বাদে।

কল্যাণ আচার্য

বুড়োর মতন

আঃ। কি হচ্ছে? আস্তে। চুপ কর।
এত যদি বক, তবে দেখবে কখন?
এখনো তোমার চোখ ড্যাবড্যাবে সূর্যমুখী,
বয়সের গরমে—
রক্তমাখা পুঞ্জ তুমি অক্লেশে হজম কর।
তবু বকবক কেন কর
হাড়ভাঙা বুড়োর মতন?

সুভদ্রা স্মরণ

শক্তিশেল পাশুপত ব্যর্থ হয় সব
মাঝে আছে
শিখণ্ডী ভালোবাসা
উর্বশীর চাতুরীতে সুখ
জমে যায় আগ্রাসী আঙ্গুলের উপবাসী খাঁজে
সোমত্ত কাদার তাল
জৈব শরীর
ভাঙ্গে
গড়ে
গড়ে
ভাঙ্গে
ভয়ংকরী পদ্মার পিপাসা
কাঙ্গাল শরীর জুড়ে খেলা করে
ঝাঁক ঝাঁক
শিহরণ মাছ অর্জুনের অপেক্ষায়
বহুজন্ম পার হয়ে আজও
মায়াময় ধমনীতে চলে সুগন্ধী সুভদ্রা স্মরণ .....

দেবোপম চক্রবর্তী

এক একটা মুহূর্ত

এই যে এক একটা মুহূর্ত যখন—
ভাল লাগা-না-লাগার সু-বাতাস না পেয়ে
অসীম অনাব্যতায় গুণে টেনে ফিরি!
কল্পিত নায়িকার আশ্চর্য শরীর, সুখ
অদৃশ্য ভিলেনের হাতে সঁপে দিয়ে
ভৌতিক শিহরণে শিস্ দিয়ে উঠি।
কারণ এটা একটা সময়ই নয়;

কারণ 'আমিটা এখন এক ঘেয়ো কুকুর।
তীব্রস্বরে এক কলি শ্যামাসংগীত কিংবা
নিজস্ব সুরে গাই প্রভাতী খবর।
সারা বাড়ী গামছা পরে ঘুরে ঘরে
পুরানো চিঠি ছিঁড়ি অতীতকে শাপান্ত করে
নিজের ছবির কাছে ধূপ জেবলে হাসি।
আয়নায় ভেংচি কাটি পাপমন্যতায়।
আমার নাকি খিদে পায় বড়ো অসময়
ছোটবেলা-তাই মায়ের তিতি-বিরক্তি
এখন কি খিদে পেয়েছে আমার কিসের ?
প্রেমের না বিশ্বাসের ? কবিতার না জিজ্ঞাসার ?
এই যে এক একটা মুহূর্ত যখন… !

সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতার জন্য

তুমিই বল তোমাকে
পেয়েছি কিনা কবিতা
যদি বল 'না'
আমি নত হবো
নোংরা করবো না
তোমার পুকুর
মরা মাছ হয়ে

চলছে খননের কাজ, চলবে
নিয়ত হবে শব্দ
শব্দভাঙার
পাতাল খুঁড়ে আনবো
তোমার প্রতিমা
চিরবাঞ্ছিত আমার
কবিতা

যুধু তোমাকে পাওয়ার জন্য
কাক, বক, চিল বা শামুক
যা বল হবো
মাছরাঙ্গা হয়ে তুলবো তোমায়
গভীর জল থেকে
যদি না পাই তবুও নাগাল
শকুনি হয়ে ছিঁড়বো
তোমায়
কিংবা শৃগাল।

কুমারেশ চক্রবর্তী

সেদিন এসো সুরঞ্জনা

সেদিন এসো সুরঞ্জনা। যখন সর্বত্র ঘুরে
তুমি হবে দিশেহারা, সবার ফেলা আবর্জনায়
তোমার ঠাঁই মিলবে না সেদিন এসো সুরঞ্জনা।

এখন তোমার ভরা গাঙে মিলবে অনেক তরী
অনেক লোকেই গালবে ডুব সাঁতরে হবে পার।
জল ঘোলাতে আসবে উভচর। এখন তুমি ভরা নদী।
পাহাড় ভাঙা স্রোতস্বিনী এখন কেন আমায়!

আজ নয় সেদিন এসো সুরঞ্জনা,
যখন তোমার বুকে জমবে পলি এমন গতি থাকবে না
নাও বাইতে কোন মাঝি আসবে না আর ভুলে,
শিয়াল-কুকুর হাঁটতে যাবে তোমার ওপর দিয়ে,
সেদিন এসো এসো আমার সুরঞ্জনা!
আমি রইবো বসে দুয়ার খুলে তুমি এসে সন্ধ্যা দেবে বলে।

শিশির গুহ

শূন্যের উদ্যানে

যুবতীরা পাখির মতন
মন থেকে মনে উড়ে যায়—
বিচিত্র ইচ্ছারা সব ক্রমশঃ সোচ্চার ॥

তবু মন ছুঁতে চায় সুখের আকাশ
সুখ-দুঃখ বোধগুলি সতেজ নিস্তেজ,
ভাবনারা সর্বদাই অফিসের ট্রাম
জ্যাম হয়ে থাকে নিরন্তর ॥

বিলোল কটাক্ষে হাসে মুহূর্ত যৌবন
আকাংখার কুঁড়ি ফোটে সুগন্ধ ছড়ায়,
স্বপ্নগুলি নিরন্তর শূন্যের উদ্যানে
সিঁড়ি ভেঙ্গে করে রোজ সূর্য প্রদক্ষিণ ॥

বেণু সরকার

অবিরাম ঝুলে থাকা

না প্রিয়জন না প্রতিবেশী তুমি সারাক্ষণ পড়ে আছো এইখানে
আত্মার ঘনিষ্ঠ হয়ে মননের চৌরাস্তায় জড়িয়ে আছো শূন্যতায়
পরিস্থিতি কম্পমান পাকস্থলী অনাহারে তথাপি ছড়িয়ে আছো
—প্রসারিত বাহু উন্মুখ জলাশয় উপেক্ষিত দুঃখসংকুল গল্প

কথা ছিল তুমি এলে বালাসন তিস্তা বুকে নেবে পরিচ্ছন্ন মান্দাস
রায়মাটাঙ্ জলদাপাড়ায় বুনো-গোলাপ ভয়ংকর গন্ধ ছড়াবে

তোমার ঘনিষ্ঠতা পেয়ে কিছুই হলো না এই নির্মক্ষিক চৌরাস্তায়
না পরদেশী না প্রতিবেশী তুমি সারাক্ষণ পড়ে আছো এইখানে
পড়ে পড়ে শুনিয়ে যাচ্ছো ভালোবাসা বিনিময়ে কতোবার
দুঃখ পেতে হয়

বিমর্ষ চাঁদ কেন বারবার লুকিয়ে পড়ে শ্রাবণের সন্ধ্যায়
এ্যাতো সব ঘটে যাবার পরেও আমি সুস্থতার মুখোশ পড়ে
অবিকল ঝুলে আছি

অসীম বসু

বাঁশী

বাঁশীর গানে সুর ছিল তাই
ময়ূরপংখী উড়ছিল
কোন্ জানালার কপাট খোলা
মুক্তা আলো ঝরছিল।
সামনে তখন আকাশ
আর দিনের ভিতর দিন
নৌকাখানা স্রোতের টানে
সাগরপানে ছুটছিল।

পলাশ মিত্র

এক-একটা দিন

এক-একটা দিনের মধ্যে
বহুবার জন্ম নিতে হয়।
বহুবার বহুভাবে
প্রকাশ্য অথবা গোপনেঃ
বহুবার বহুভাবে
অজস্র পথের ভিতর
কঠিন আবর্ত পার হয়ে
জন্ম নিতে হয়

এক-একটা দিনের মধ্যে
বহুবার স্নায়ুতে আঘাতঃ
স্খলিত জটিল বোধহীনতায়
দগ্ধ করতল।

মুহূর্তকে বিশেষ করবে বলে

একটি বিশিষ্ট মুহূর্তকে বিশেষ করবে বলে
ওরা গুটিয়ে নিলে কাগজ, দোয়াত আর কলম—
অজস্র রাত্রির অনলস তপস্যা হোল আরম্ভ,
বিদগ্ধ হোল অনেক কাঠ, খড়িকা আর বিচালী—
স্বর্গীয় উদ্যানে ফুটল না প্রত্যাশিত পারিজাত ।।

চোখ খুলতেই পৃথিবীর বদল হোল অনেক,
বিজ্ঞানীরা চলছেন নিত্য গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ;
অদৃশ্য মানব ওড়ে, ঘোরে তৃতীয় কল্পিত বিশ্বে
এবং দেখা গেল আপনার গলিত নখ ও দন্ত—
স্বর্গীয় উদ্যানে ফুটল না প্রত্যাশিত পারিজাত ।।

স্বরলিপি

যাদের কলধ্বনি শোনা যায়
সকাল বিকাল কিম্বা সন্ধ্যায়,
যারা প্রতিটি মুহূর্ত ঘিরে রাখে
ভয়াবহ অক্টোপাশের মতো,
যাদের জুলুজুলু চোখে ভাসে
আতুর কথাচিত্র ।

ইতিহাসের রক্তাক্ত পাতার
সেইসব ব্যক্তিরা
যাদের প্রতিটি রক্তবিন্দু মিশে গেছে
এ দেশের প্রতি অণু-পরমাণুতে ?
ওরা এখন আলো চায়, শান্তি চায় ।

সবার জন্য পুষ্পাধার

দুর্ঘটনা কারো জন্য নয়
ভাগ্যক্রমে পড়ে যখন গিয়েছি চাকায়
লেলিহান খরদন্ত যুঝে নেব বলে
ফুটপাথে অন্ধ ভিখিরি ক্লেশ হেসে লাঠি হাতড়ায়—
সময় হয়েছে তার দাঁড়াবে সে ট্যাক্সির দরোজায় ।

তুমি কবিতায় বিলি কাট বিচূর্ণ কুন্তল
কল্পলোকে বহুবার ভিখিরি সে কবিতায় কেটেছে জাবর
রসনায় ডিমের স্বাদ স্বপ্নলব্ধ বলে
খুঁজেছে সে জীবনের তিন হাত ফোকর ।

জননীর নিচ্ছিদ্র জঠর খুঁজে হয়রান হলে
আত্মগ্লানির যাবে না সম্পাত
মায়ের মতন নাম অনাঘ্রাতা ফুল ভাবলে
ফ্লাশ বাল্‌বে ঝল্‌সে ওঠে
লেন্স রেখে পুরাতন দশমাসের দিকে ।

দুর্ঘটনা কারো জন্য নয়
বেলা দশটায়
যে বণিতা অঘোরে ঘুমোয়
তারও জন্য আছে পুষ্পাধার—
মোজাইক বাথরুম উদ্গত ককটেলে ভাসিয়ে
চেতনার গণ্ডুষ ভরে স্বর্গের জলপান—
লিখে যাচ্ছে প্রতিদিন জীবনের অসংখ্য যৌগিক কবিতা ।

সুচেতা মিত্র

এই হাওয়া অন্ধকারে

এই হাওয়া
এই অন্ধকার
ঠেলে ঠেলে ক্রমশই চলে আসব
মাঠের মধ্যে ফসলের ঘ্রাণ
আমার সৃষ্টির মহিমা
আমার হাত থেকে রক্ত ঝরে
বুকের মধ্যে পাথর ঠাসা

গ্রহমণ্ডলের পথ
আমার নাগালের বাইরে
অন্ধকার সরিয়ে দাঁড়াতে চাই
এক টুকরো আলোর মধ্যে
কেন পারি না জ্বলতে পারি না
কেন পারি না প্রচণ্ড আলোয়
জ্বলে উঠতে ?

নীরদ রায়

এখন এইসব ব্যক্তিগত স্বদেশ

কেউ আর আগের মতো বলে না 'কেমন আছো'
বরং এক একজন এক একখানে স্থির হয়ে থাকে পৈত্রিক মেজাজ
কাছে এসেও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় জন্ম সহোদর কথাগুলো
এখন এই সব ব্যক্তিগত স্বদেশ
এখন এইসব অনর্গল রূপান্তর সংবাদ—
অথচ তারো একটু আগে যখন রাত থাকতে রাত নয়
চোখে মুখে রাতের মতো আবছা অনুভব—
আমরা সবাই কথা দিয়েছিলাম
ভাঙা কাঁচের টুকরো দিয়ে আর যাই হোক

সংসারী হাওয়াকে গুলিবিদ্ধ করবো না কখনো
বরং কথা দিয়েছিলাম ভাঙা কাঁচের টুকরোকে
আমূল সরিয়ে ফেলা হবে—
'—স্পর্ধাহীন আবহাওয়া নিজস্ব স্বভাব
শুধু স্বপ্ন নয়, অবিরল স্বপ্নের মতো দিনযাপন—'

অথচ কেউ আর বারোয়ারী প্রতিশ্রুতি মনে রাখে না
মনে রাখে না গতরাতের নিরুপায় যন্ত্রণার উপশম
শরীরে শরীর ঘেঁষে দু' একটি বাস্তবিক কথাবার্তা !

প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ

প্রেমের পাশা

পায়ের তলায় দ্বিধান্বিত মাটি
কেমন করে' চলার কথা বলে
একটু দাঁড়াও, পেছন ঘুরে আসি
এখানে ঝোপ বাবলা কাঁটা লতা
সরিয়ে তবে কেমন করে যাওয়া
অঙ্গুরীয় বিনিময়ের পথ
বন্ধ ফের, ঘরেও আলো নেই
সেখানে বড়ো অন্ধকার
কুরুশে বোনা বিশেষ প্রয়োজনে
ছিঁড়লে তবু কুয়াশা থোকা থোকা
দু' নখে তুমি, জ্বললো না তো প্রেম,
এখানে বড় আর্দ্রতার বালি
চলার পথে রক্ত ফোঁটা ফোঁটা
আজকে আয়ু মৃত্যু মুখোমুখি
দেখবে না কি পাঞ্জা কষা চলে ?
অঞ্জলিতে ছুটতে যায় নদী,
স্বপ্নে আমায় সঙ্গে রেখো রাণী,
বিরলে কিছু অহংকার দিও,
প্রেমের পাশা খেলাও যদি দেখি।

দেবব্রত মণ্ডল

খেলছো খেলা

মেজাজে খেলছো খেলা
সজাগ থেকো
চতুর চোখে তাকিয়ে দেখো
কোথায় পাতা
শয়তানীদের কুটীল হাত।

হাতের চাল চেলো নাকো
সময় আছে সমঝে চলো
খুব হুঁশিয়ার ভুলো নাকো
শয়তানেরা পেতেছে ফাঁদ
ভুল করলেই করবে কাত।

একটু বুঝে মাথা ঘামিয়ে
চোখ বুলিয়ে দিও চাল
মাথা খাটিয়ে এড়িয়ে ফাঁদ
করতে হবে কিস্তি মাত।

পরেশ সাহা

বাঙলা ঃ ১৩৫০

ভোরের নরম রোদ কাঁচা রোদ রেশমের মতো
সজনে পাতার ফাঁকে পড়েছে ঝুলে,
ওলো খেঁদি দ্যাখ্ দ্যাখ্ বাবুদের জানালায়
ঝিকমিকে রোদে সোনা দিয়েছে গুলে'।
ও পাড়ার কালু শেখ জনাবালী মোল্লার ব্যাটা
নেমে গেছে পাকা রাস্তায়,
আর দূরে কুলুপাড়া চালখোলা ঘরগুলি
দাঁড়িয়েছে তারই কাছটায়।

মদুনার মা নাকি মারা গ্যাছে শুনেছিস
রায়দের বাগানের ঐ ও পাশে ?
কচু বন আর যত ফণীমনসার ঝোপ
জড়িয়ে রেখেছে সেথা নরম ঘাসে।
ঘুটঘুটে আন্ধার গাব গাছটার তল
ঠিক যেন নরকের জঞ্জাল জমা,
চুরি করা কোনু এক গরুর দড়ির পাকে
ঝুলে গেছে হায় ট্যারা মদুনার মা।
আহাগো, বেচারীর দু'দিন জোটেনি ছোলা লাইনে,
কাপড় ছিল না মোটে পরতে ;
মানুষের মাঝখানে খিদেয় শুকিয়ে গেল কয়দিন,
কেউই এলো না দয়া করতে।
শুনলাম মদুনাও হয়ে গ্যাছে পল্টন
শহরে লিখিয়ে নিজ নাম,
কি-ই বা করবে আর বলু,
রাজ্যের লোকগুলো যতসব হিংসুক,
জানে শুধু ছল আর ছল।
ও কি তুই ওলো খেঁদি
ঘুমিয়ে পড়লি আবার দূর দূর ছাই,
পথের লালচে মাটি বেশ লাগে বুঝি ?
ও-পাশের খোলা মাঠে উপোসী কাকেরা সব
জমিয়েছে ভীড়,
এখানে সেখানে দু'টি ছোলা-দানা খুঁজে।
ওলো ওঠ্, ও খেঁদি কাপড় জড়িয়ে নে ;
বেলা হয়ে গেছে লাইনের,
দুটি ছোলা না হলেই নয় ;
মুখপানে চেয়ে চেয়ে, হাসবে রহিম মিয়া
হাসুক বাঁদর,
আমাদের অতো কেন ভয়।*

* কবিতাটি ১৩৫০-এর বাঙলার দুর্ভিক্ষের কোন এক সময়ে লেখা।

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লাল নীল

লাল নীল কালো সবুজ
কেউ ফিকে কেউ গাঢ়
ঝলসানো আলোর সামনে
বহ্নি আর বিন্দুতে যেন
পাশাপাশি গা লাগিয়ে
দাঁড়িয়ে থাকে প্রত্যয়ের দাঁড়
ধরে।
কবে কোথায় বা কেন
কোনো প্রশ্নের নেই কোনো
জবাব। কেবল পিপাসার তিমিরে
শ্বেত পারাবতের হাতছানি।
আর হিমঝরা রাতে ধোঁয়াশার
কুহেলিকা।

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

কবিতাবলী

১

পুষ্যি আমার তিন বেড়ালী, পোষ মেনেছে
খাঁচায় দুটি ময়না।
কিন্তু আমার সুখের প্রহর, যতই তাকে লালন করি,
বুকের ভেতর অনন্তকাল রয় না।

২

রাজপথে ঘুরেছি সারাদিন, তবু কোনো রাজাকে দেখিনি।
না হয় আমার নেই, রাজ্যপাট,
আমি একা থাকব মহারাণী ?
তোমারও কি পাব না সাক্ষাৎ ?

৩

যেদিন পুকুরে চাঁদ খান্ খান্ ভেঙে গিয়েছিল,
সেদিন ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলে তুমি,
পুকুর ছিল না স্থির সেইদিন মধ্যরাত্রি বেলা।
আজকেও আশ্চর্য চাঁদ শালের জঙ্গল ঘেঁষে হেঁটে আসছে
শাদা এক ভালুকের মতো,
তাকে নিয়ে খেলা যায় 'চাঁদ, চাঁদ' খেলা ?

৪

দূর থেকে এসেছিলি, পুনরায় দূরে চলে গেলি,
এখানে ছিল কি অন্ধকার ?
সময় যদি-বা পাস্, তাহলে আসিস্ তুই চৈত্র শেষে পূর্ণিমার রাতে,
ষোলয় পা দেবে কৃষ্ণা নিশ্চিত এবার।

মণীন্দ্র গুপ্ত

প্রার্থনা ও উত্তর

'রেখ মা দাসেরে মনে' – এই ইচ্ছা উত্থিত যেমতি
শুনতে পাই বলছেন তিনি ঃ 'কেন মনে রাখব তোরে বাছা ?
দু-চারটে কবিতা লিখছ বলে তোমাকে কি মনে রাখতে হবে !
শোনো বৎস, ভুল আশা রেখ না কোথাও,
আমি মনে রাখি না কিছুই।'

'সে কী কথা মাতঃ, আমি রাত্রি জেগে খনি খুঁড়ে পালিশ করেছি রত্নরাজি
তারপর সুমুদ্রিত রেখেছি তোমার পদাম্বুজে।—তুমি তাকে গলায় পরবে না ?'

'শোনো বাছা, আরবার বলি, আমি নিই না কিছুই। মুখ্যদল
ঢক্কার নিনাদ করে ; পূজা নয়, কোন্দল জটলা ভরে বারোয়ারীতলা ;
আমি অচিরে সে ব্যভিচারী শব্দপুঞ্জ ঠেলে দিই অশব্দ প্রদেশে।
আর বৎস, তোমার কবিতা ?—জন্মজরামরণের গর্জনচিৎকারকান্না
সেও মুছে দেব। তোর ঐ সুমুদ্রিত, বাসনায় লিপ্ত শ্লোক
পোকাদের আহার করাব। আমি সব ব্যর্থ শব্দ কালের নিঃশব্দ জলে
ঠেলে দিয়ে আকাশ পবিত্র রাখি ;—আমার নির্দয় লোভ
বার বার নতুনের দিকে।
বাছা, মনে রেখ না নিষ্ফল কোনো আশা ॥'

সমীর ঘোষ

মনিকর্ণিকার ঘাটে

মনিকর্ণিকার ঘাটে অনির্বাণ চিতা জ্বলে
কার অস্থি ভেসে যায় গঙ্গার অতলে—
প্রৌঢ় বেশ্যা অপরাহ্নে সাজে
দূরে ঘন্টা বাজে।
এখন ঈশ্বর এসো পারো যদি আগুন নেভাও
মনিকর্ণিকার ঘাটে জ্বলে ওঠে সিক্ত হৃদ্যতাও।
কার দুটি রক্তপদতলে,
স্মৃতির সিঁদুর জ্বলে
কাছে গঙ্গা, অস্থি ভেসে যায়
প্রাচীন বেশ্যারা পোড়ে মনিকর্ণিকায়॥

সমীর চট্টোপাধ্যায়

কতদূরে যাব

আর কতদূরে যাব
পথগুলো একে একে এসে হয়েছে
দুরন্ত খরস্রোতা নদী
দুঃখের ধূলিকণা এক হয়ে জমেছে পাথর
সবাই যে যার পথে চলে যায়
আমি কেবল নিজের মধ্যে ঘুরি

পথ চায় আরও পথিক, নদী চায় আরও জল
শব্দ চায় ধ্বনিময় আপন স্বর নিজস্ব পূর্ণতা
রাত চায় অন্ধকার, দিন চায় জ্যোৎস্নার আলো
বুকের মধ্যে জমে থাকে তুষের আগুন
আর কতদূরে যাব,
কেউ এসে ভেঙে দাও বিকেলের ঘুম।

সুতপা মিত্র

জানলাটা খোলাই থাক

জানলাটা খোলাই থাক্
হয়ত ধুলোয় ঘর ভরে যাবে
অবিন্যস্ত এলোমেলো হাওয়া ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো
ওলপ-পালট করে দেবে
তোমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে ভুল হয়ে যাবে
কিম্বা বিজয়া সম্ভাষণ

হয়ত বৃষ্টি শিষ্টাচার না মেনে
ঢুকে পড়বে আমার ঘরের মধ্যে
আমার অনুমতি না নিয়েই
সাজানো আসবাবগুলোর গায়ে
জলের আঁচড় কাটবে শিশুর সারল্যে

হয়ত ঈর্ষালু রোদ্দুর প্রচণ্ড আক্রোশে
আমার আঁকা রঙীন ছবিগুলো
এমনকি আমার স্বপ্নগুলোও
বিবর্ণ করে দেবে

হয়ত ব্যাধি বীজাণু অবারিত
ঢুকে পড়বে আমার ঘরে

তবু জানলাটা খোলাই থাক্

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বসন্তেও আর তার কচিপাতা নেই

প্রৌঢ়া নারীর কাছে ক্রমে জমা হয় স্মৃতি ও দুঃখ, চামড়ায় ভাঁজ পড়ে
আর উজান দুঃখ ঠেলে তার প্রাণান্ত প্রয়াস ফিরে যেতে যৌবন-সমুদ্রে,
তার ফেলে-আসা-পথ ঃ যেখানে ছড়ানো সোনা, টান-চামড়ার-ছিলা,
স্তনের কঠিন পেশী ও ঠোঁটের উষ্ণতা—
সে নারীর বিছানায় রাত বড়ো হিম হয়ে নামে, অনেক চিন্তা কামস্বপ্নেও

শিথিল শরীর ফুঁড়ে আগের আগের মতো জ্বলে না আগুন
জ্বলে যায় কৃষ্ণচূড়ায় লাল ডাল, কামারের হাপর ও গনগনে আঁচ
জ্বলে না বিছানা চামড়ায় ভাঁজ পড়ে, ক্রমশ কুঁকড়িয়ে যায় মন ও শরীর
বয়স দেয় না রেহাই কারোকেও, বয়সের ভার গোপনে গোপনে
চারদিকে হয়েছে চাউর
তাই ডালপালা থেকে ঝরে যায় ফুল, পাতা, ঝরে যায় গাছের বাকল,
ঝরে গেছে নরম শরীর থেকে কমনীয়তা, স্নিগ্ধ সুষমা,
বসন্তেও আর তার কচিপাতা নেই
শুধু জমে যায় ক্রমে ক্রমে স্মৃতি ও দুঃখ, চামড়ার ভাঁজ বেড়ে যায়—

সুগত বড়ুয়া

অন্য ভাবনা

শেষ ট্রামের চাকার শব্দ
চঞ্চলতা বাড়ায়
তাড়া খেয়ে বাইরে আসা ছেলের মত
সারাটা শরীর নিয়ে
বারান্দায় পায়চারি করি
ঘৃণা রক্তের ভিতর
নিঃশব্দে অবকাশ খোঁজে।

অসংখ্য সুখের মাঝে সারাবেলা কাটিয়ে
রাত্রিকে ঘিরে নিয়ে এলাম
নিঃশব্দে বাড়ী ফেরার পর
শেষ ট্রামের চাকার শব্দ
আবার চঞ্চলতা বাড়ায়।

শেষ ট্রামের চাকার শব্দে শব্দে
আমার ভয় বাড়ে
দুহাতে যাবতীয় সংশয় -
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নানা চেতনা
নিঃশব্দে কাজ করে বুকের ভিতর।

ওয়াজেদ আলি

পাখিরা উড়ে গেলে

পাখিরা উড়ে গেলে
আমাদের শস্যের ক্ষেতে
পড়ে থাকে হলুদ পালক
আর সেইসব দ্যুতিময় ভালবাসা
শব্দ সম্ভার
স্মৃতি জমে থাকে
মনের ভিতর

তাই আমাদের সব অশ্রু
শব্দের ভিতর
আজীবন সুর হয়ে বাজে

রবীন সুর

আপেক্ষিকতার শান্তি

ট্রেনে যেতে যেতে বৃষ্টির তির্যক রেখাগুলিকে সমান্তরাল মনে হয়েছিল
ভেবেছিলাম
বাতাসে বৃষ্টির আমেজ ছড়ানো থাকলেও
মাটি ভেজেনি
এভাবেই মাধুরীর হাঁটুর নিচে
পায়ের ডিমে দু' টুকরো চাঁদের চেহারা দেখতে দেখতে
বুঝতে পারিনি
কখন তার মুখ অমাবস্যার চাঁদের মুখোস হয়ে গেছে

কোনো কিছুতে নিবিষ্ট হলেই
সব অমনোযোগ চারধারে বল্লম উঁচিয়ে
নরখাদক মানুষের মত ধেই ধেই করে নাচতে থাকে
হুতেল ছিলো দম্বু চিরাক হম্ব জম্বু খোয়াম্বো

অথচ সকলের প্রতি একই সঙ্গে আশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব নয়
হাত বাড়ালে পায়ের নিচে মাটি চুপ করে দাঁড়িয়ে যায়
পথিক হলেই হাতগুলি কাঁধের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়
কিছুতেই কিছু আর হওয়ার নেই
এখন মাথায় কাঁটা হেঁটোয় কাঁটা
আপেক্ষিকতার এক অস্বাভাবিক শান্তি
আমাকে অনিবার্যভাবে জব্দ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে!

ভাস্বতী রায়চৌধুরী

হয়তো এই হাওয়ার জন্যে

হয়তো এই হাওয়ার জন্যে
দুদিন যাবৎ শরীরও খুব ভালো যাচ্ছে
যখন তখন চমকে উঠি
বন্ধু-বান্ধব ছিল তো বেশ কিছু
শেষ কবে কার দেখা পেয়েছি যে
কোথাও যাওয়ার তাড়াও তো নেই
বুকের মধ্যে গহন গভীর ঝিমধরা রাত
বৃষ্টি-বাদলা ঝড়-ঝাপটা
ঋতু বদল হয়নি তো কম।

এখন কেমন ছায়ায় ছায়ায়
ধীরেসুস্থে হাঁটি চলি
রাত-বিরেতেও বড় একটা
ঘুম ভাঙ্গে না, স্বপ্ন নেই
কে নেই! কি নেই!
আমি তো বেশ আছি
ভালোই আছি
ভালো লাগছে
হয়তো এই হাওয়ার জন্যে
দুদিন যাবৎ শরীরও খুব ভালো যাচ্ছে

সুধীর ঘোষ

হাতে হাতে সূর্য উঠা

হাতে হাতে সূর্য-ওঠা গাঢ় গর্ব নিয়ে
হে নির্জন নারী তুমি
আমার প্রান্তপথে ক্রমাগতি চেয়ে নাও।
রোদসী বশ্যতা মানি,
ভিজে গন্ধে আমাকে অন্বিষ্ট করে
আমার সে-কালের কলস।
বহুধা চুম্বনে ফোটে ফুল
স্পন্দন যতক্ষণ তত দীর্ঘ বনমালীপুর।

জীবন সরকার

কখনো আসেনি

শস্যের গন্ধে
রাখালিয়া বাঁশি কখনো আসেনি।
যে আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে!

পৃথিবীর সারা গোলকটার কপাট খোলা
হেঁটে গেলেই হয়।
তৃণভূমির মাঝখানে
ঝাঁ ঝাঁ রোদে বোঁ বোঁ করছে জীবন।
ইচ্ছার খোঁজে গুবরে পোকা পিছলে পড়ে যাচ্ছে
মধ্যরাতে গোপন পাড়ায়।
দৌলত দিয়ে আগুন পোহানো—তৃপ্তি সে কোথায়।

অনন্তকুমার সাহা

মায়াবী পাখীর চোখ

আমাকে বিষণ্ণ করো সময়ের গধূলি অবসাদ,
বিষাদে বিকল্প নেই। নিষ্ফলা মধ্যাহ্নে উবে যায়
স্মৃতিময় হিমবাহ ; জরাচিহ্নে বিপন্ন সুষমা
পিচ্ছিল তরুকের ভাঁজে মুছে দিচ্ছো অগুরুর ঘ্রাণ।

আমরা ক'জন যুবা স্রোত ভেঙে নদী পার হবো
ঠোঁটের অন্তিমে মাখি সময়ের তেজস্ক্রিয় ফেনা,
নিঃশব্দে ছই ভাঙে নৌকোর গলুই-এ ঢোকে জল ঃ
কুটিল আবর্ত ঘিরে জীবনের বন্য চতুরালী।
শোকে ম্লান যুবতীরা বৈধব্যে ঘরে ফিরবে না।

কালের মিছিলে মৌন মুখ ঢাকি মুমূর্ষু প্রতীকে
ক্রমিক আক্ষেপে ক্ষুন্ন হয় শস্যের অন্তর্গত মৌল
সুখ। সময়ের সম্মোহনে বিভ্রান্ত প্রহর জুড়ে
বৃথা কানামাছি খেলা ; ব্যাধের উজ্জ্বল শরক্ষেপে
মায়াবী পাখীর চোখ গূঢ় কান্নায় বিদ্ধ হবে না।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সে জানে

সে জানে উত্থান কেন গিয়েছিলো
বৃক্ষের নিবিড় কাছাকাছি !
যেমন কাণ্ডের গড়ে ওঠা, রৌদ্রলিপ্ত উদয় কুসুমে
যে রকম গাঢ়, তার !
চল্লিশ শীতের দেহে তারো বেশী জাগরূক ঘ্রাণ
সুতীব্র ধাবনে তাকে নিতে চায় বসন্তের দিকে !

হাতে যূথবদ্ধ বর্ণমালা, আশেপাশে ভ্রমর রমণী, যারা
নিয়েছে এবং কিছু দিয়েছেও দুঃখ বা সুখের মতো,
কেউ অন্ধকারে হারে কেউ বা ভীষণ জেতে কাঁবতার ত্রাণে
তবু বয়স ফুরিয়ে আসে, পৃথিবীর মায়ামুগ্ধ দিন
শ্লথ বল্কলের আঙ্গিকে ঝরতে থাকে,
গাছের শিয়রে এসে থমকে দাঁড়ায় সূর্য,
কেননা নিচেই একজন আলাদা মানুষ
ছায়া মেখে বসে আছে শিকড়ের কাছে।

শিশির ভট্টাচার্য

কবিতা

আমার দুঃখের বনে
তুমি কোন্ শব্দের মিছিল ধরে'
চলো আনমনে,
অথবা গোপনে
ছুঁয়ে যাও বাতাসিয়া লুপের মতন
শরীরে জড়ানো সেই সুখ সুখ শাড়ী ;
যেন দাও পাড়ি,
ঘুমের স্টেশান ছেড়ে খেলা রেলগাড়ী ।।

আমার দুঃখের বনে
অতন্দ্র বিশাল
ডানা মেলে জাগে মহাকাল
যন্ত্রণারা—
তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা গরুড়ের মত
অবিরত
ছায়া ফেলে কারবালা কঠিন প্রান্তরে,
উরুভাঙা দুর্যোধন মৃত্যু গোণে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে।

কেননা সেখানে
রাত ভোর যায় আসে জোনাকি স্মৃতিরা
মান সরোবরে ॥

তখন তারারা নামে
রাতের আকাশ থেকে
ঝরে পড়ে শব্দহীন নিচে
পুতুল সংকোচে
তখন বৃষ্টির ধারা
নিঝুম নিথর ঝরে
পৃথিবীর আতপ্ত শিয়রে
এবং সোনালি রোদ
অমল বন্যার মতো
জেগে থাকে প্রতীক্ষার ঘরে।
শবরীর বরে ॥

বিদেশী কবিতা ঃ

জার্মানী
গুন্টার গ্রাস

[জন্ম ঃ ১৯২৭ দান জিগ-এ। বর্তমান বাসস্থান বার্লিন। সুইস স্ত্রী, প্রাক্তন নর্তকী। চারজন ছেলে মেয়ে।

গুন্টার গ্রাস উপন্যাসকার হিসেবে বেশি বিখ্যাত, কবিও। উপন্যাস তিনটি ১. The Tin Drum ২. Cat and Mouse ৩. Dog Years কবিতার বই-এর সংখ্যাও তিন।

গ্রাস টেবিল চাপড়ে বলেন শিল্পীরা হচ্ছেন entertainers এবং এমন কি কবিরাও 'Court jesters who write'. 'Poems admit of no Compromises', তিনি লিখেছেন, 'but we live by Compromises. whoever can endure this tension every day of his life is a fool and changes the world !]

১. সংসার সংক্রান্ত

আমাদের যাদুঘরে—আমরা সর্বদা সেখানে যাই রবিবারে—
সম্প্রতি তারা খুলেছে একটি নতুন বিভাগ
আমাদের গর্ভপাতিত শিশুরা, বিবর্ণ, রাশভারী ভ্রূণগুলি
বসে আছে শাদামাঠা কাচের বয়মে
এবং উদ্বিগ্ন তাদের মা বাবার ভবিষ্যত ভেবে।

২. পশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা নিবারণ

পিআনোটি চিড়িয়াখানার ভিতরে।
জলদি নিয়ে চলো জেব্রাটিকে সবচেয়ে ভালো ঘরে।

সদয় হও এর প্রতি,
এটি এসেছে বেথস্টাইন থেকে।
এর জাবনা আছে কুড়ি রকম,
আর আমাদের মধুর শ্রুতি।

৩. সুখ

একটি খালি বাস
সশব্দে যাচ্ছে ছুটে তারাভরা রাতে।
হয়তো ড্রাইভার গাইছে গান
এবং সুখী কেননা সে গান গাইছে।

৪. **অসফল আক্রমণ**

বুধবার।
প্রত্যেকে জানতো কটা সিঁড়ি,
বাজাতে হবে কোন্ বেল,
বাঁ হাতের দ্বিতীয় দরোজা।
তারা ভেঙে ফেলেছিলো টাকার দেরাজ।
কিন্তু সেদিন ছিলো রবিবার
তাই টাকাকড়ি গীর্জায় গচ্ছিত ছিলো।

৫. **রাতের স্টেডিয়াম**

ক্রমশ ফুটবলটি আকাশে উঠে গেলো
এখন দেখা যাচ্ছে স্ট্যাণ্ডগুলি উপচে ভরে গেছে।
কবি একা দাঁড়িয়ে ছিলেন গোলে
কিন্তু রেফারী হুইশ্‌লে দিল ঃ অফ সাইড।

অনুবাদ ঃ কবিরুল ইসলাম

রাশিয়া

Boris Pasternak বরিস পাস্তেরনাক্

[নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রুশ সাহিত্যিক বরিস পাস্তেরনাকের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। এখানে তাঁর দুটি কবিতা The Nobel Prize ও The Night Wind-এর অনুবাদ প্রকাশ করা হল।]

১. **নোবেল পুরস্কার**

এখন নিক্ষিপ্ত আমি ফাঁদে পড়া জন্তুর মতন ঃ
কোথাও অপেক্ষা করছে আলোক জনতা স্বাধীনতা ঃ

কিন্তু পিছনে আমি শুনতে পাচ্ছি তাড়া করে ফিরছে আমাকে
কারা যেন। পালাব যে পথ নেই কোথা।

গাঢ় অন্ধকার বন, বেষ্টিত হ্রদের উচ্চ তীর,
শুষ্ক কাণ্ড ভূপাতিত নিহত বৃক্ষের, রিক্ত ম্লান,
আমার পথের সীমা চারিদিক থেকে সংকুচিত ঃ
যা হবার হয় হোক ; এখন আমার কাছে সবই সমান।

আমি কি অন্যায় কিছু অপরাধ করেছি তাহলে ?
আমি কি ঘাতক খুনী, দুর্বৃত্ত পামর ?
কারণ পৃথিবী শুদ্ধ ভাসিয়েছি আমি অশ্রুজলে
আমার দেশের মুগ্ধ সৌন্দর্যে, অমর ঃ

কিন্তু তবুও আমি কবরের ভিতরে গিয়েও
বিশ্বাস করব—আসবে সময় একদা
যখন বিদ্বেষ হিংসা অন্যায়ের প'রে
নিশ্চিত বিজয়ী হবে শুভেচ্ছা, সত্য সততা।

২. রাতের হাওয়া

আঁধারে আবৃত সব। যুবকেরা ফিরে গেছে ঘরে
উল্লসিত পানপাত্র ফেলে রেখে। প্রদীপ নিভেছে।
আজকে রাতের মত গান আর মাতালের হল্লা থেমে গেছে।
কালকে উঠতে হবে প্রভাতের প্রথম প্রহরে।

এখন কেবল শুধু নৈশ হাওয়া একা পড়ে আছে
ইতস্ততঃ ঘুরছে পথে বিদীর্ণ রাত্রির প্রহরে
যে পথ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে আছে ঝোপের ওপাশে
নিয়ে গেছে শিশুদের চায়ের আসর থেকে—
সন্ধ্যার খেলা থেকে ঘরে।
মাথাটি পড়েছে নুয়ে, লুকিয়েছে দোরের পিছনে
দুর্বোধ্য রাত্রির সঙ্গে জটিলতা বাড়ে, তার ভয়ে
তার সঙ্গে সে এখন তার চেয়ে আপোষে নির্জনে
বসবে বরং ; আর তাদের অমিল সব সংগ্রাম
মিটিয়ে সে ফেলবে পরিণয়ে।

কিন্তু উদ্যানের সব বেড়াগুলি উঠে এল তাদের মতন
ঝগড়া করে পরস্পর, পারছে না শান্তি আনতে তারা
ঝগড়ার উত্তেজনা বচসার অন্তরালে ওদিকে কখন
রাস্তা পেরিয়ে আসছে শ্রোতৃদল—উৎসুক বক্ষে-জনতারা।

অনুবাদ—নচিকেতা ভরদ্বাজ

ভারতীয় অন্য ভাষা থেকে :

মারাঠি
বীণা আলাসে

শাপ

এ সম্পূর্ণ বিশ্বভারতের অতৃপ্ত পাকস্থলী
যদি
নচিকেতার ভূত সেজে
তোমার কাঁধে চেপে বসে
তাহলে
কী করবে তুমি ?
লক্ষ্মীছাড়া আকাশটাকে এনে দেবে
একজোড়া জলগর্ভ মেঘ ?

ইদানীং
লোড-শেডিংয়ের অন্ধকারে
পিলপিল করে বাইরে বেরোয়
সর্বংসহ ধাতব পুতুলদের বোবা মিছিল
কল্পনা-কুসুমাস্তীর্ণ দিগন্তের পানে
কিন্তু,
মরতে মরতে যখন ওরা প্রচণ্ড হিক্কা তুলবে—
কী করবে তুমি ?
কপালপোড়া আকাশটাকে,
বেশী না,
দুখানা জলগর্ভ মেঘ এনে দেবে ?

জ্বলন্ত লোহার দুরন্ত উত্তাপ
যার গা-সওয়া হয়ে গেছে

সেই মরা চামড়ার নীচে
দাউ দাউ করে জ্বলে অন্যায়ের স্ফুলিঙ্গ,
কখনো যদি তার বিস্ফোরণ ঘটে,
জ্বলে যদি বিশ্বগ্রাসী শিখা
কী করবে তুমি ?
হতচ্ছাড়া আকাশটাকে এনে দেবে
একজোড়া জলগর্ভ মেঘ ?

সমস্ত প্রশ্নাবলী ক্ষুধা-তৃষ্ণাকেই ঘিরে।
অথচ পরিধির শাসন লঙ্ঘন করতে পারছে না।
কিন্তু সাবধান !
চাতকের শাপ সর্বনাশের মূলে,
তা না লেগে ছাড়বে না।
ভূগর্ভ থেকে তরতর করে ফুঁড়ে বেরোবে
খচখচ করে ফুটে-যাওয়া কাঁটা,
বেরোবে রক্তের ফোয়ারা···
তখন কী করবে তুমি ?
কপালপোড়া-লক্ষ্মীছাড়া আকাশটাকে,
বেশী না,
এনে দেবে এক জোড়া জলগর্ভ মেঘ ?

অনুবাদ ঃ প্রবাসী বিনয়কৃষ্ণ

সম্পাদক, অন্যদিন

প্রীতিভাজনেষু

শিশিরবাব, 'অন্যদিন' সপ্তদশ সংকলন দেখছি। বেশ লাগছে। সম্পাদকীয়টি—যাতে কবি পরিচিতি ইত্যাদি আছে সেটিও বেশ হয়েছে। দুই সামস্থল হক সম্বন্ধে বিজ্ঞাপ্তিটিও প্রাসঙ্গিক। সন্তোষকুমার অধিকারী, মনীশ ঘটকের কবিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে চমৎকার পরিচিতি দিয়েছেন। আপনার 'অমলতাস একটি ফুলের নাম', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সিংহাসনে ঘুণ পোকা', রুদ্রেন্দু সরকারের 'ছন্দ পতন' এবং অন্যান্য বন্ধু কবিদের লেখাগুলি উপভোগ করলুম।

কবিতা ঃ পাঠক ও সমালোচক নিবন্ধটিতে চন্দ্রশেখর রায়মশাই আমাকে একটু ভুলভাবে চিহ্নিত করেছেন বলে এই চিঠি লিখছি। আমি কখনো কোথাও বলিনি যে, করুণানিধান কবি নন। শুধু এইটুকু বলা প্রাসঙ্গিক যে, "করুণানিধানের জন্যে তিরিশের দশকের কোনো প্রবণতাই দেখা গেল না" —চন্দ্রশেখরবাবুর নিজের উক্তি (পৃষ্ঠা ৮) তুলেই বলছি—এ মন্তব্য মিথ্যে নয়।

চন্দ্রশেখরবাবু যদি অনুগ্রহ করে আমার 'কবিতার বিচিত্র কথা' বইখানি পড়ে দেখেন, তাহলে আমার করুণানিধান সম্পর্কিত ভাবনা তাঁর নজরে আসবে। আমি করুণানিধানকে অস্বীকার করবো কেন ? চন্দ্রশেখরবাবুকে কথাটা জানাবেন। আমি মনে করি যে, করুণানিধান কালিদাস রায় ইত্যাদি সমকালীন প্রখ্যাত কবিরা কেউই নিজের নিজের সময়ের বেড়া পেরিয়ে দূর-কালের হৃদয়-মস্তিষ্কে সাড়া জাগাবার সামর্থ্যে বিশিষ্ট নন। করুণানিধানের মধ্যে সেরকম কোনো সূক্ষ্মতাও পাইনি যা তাঁর তথাকথিত সৌন্দর্যচেতনার অবিচ্ছেদ্য গুণ হতে পারতো।

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ডক্টরেট অভিপ্রায়ী যশোলিপ্সুদের চেষ্টায় করুণানিধান, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং সম্মানিত আরো কোনো কোনো কবি খুব বড়ো কবি বলে প্রমাণিত হতে পারেন বটে,—কিন্তু কবিতা যার জীবনে নেই, মনে নেই, চেতনার কোনো প্রান্তেও নেই, সে রকম কৃতী (?) গবেষকরা চেষ্টা করলে কী না হয় ! সেইজন্যেই কোথায় কোন্ হবু-ডক্টর 'অন্যদিন'-এর এই সংখ্যায় প্রকাশিত চন্দ্রশেখরবাবুর এই মন্তব্যটি উল্লেখ করে আমার সঙ্গে একজন অতি-সাধারণ কবিতাপ্রিয় বাঙালীকে করুণানিধানের অনুরাগীদের কাছে অপরাধী করে রাখবেন, সেই সম্ভাবনা ভেবে সংকোচবশে আপনাকে এই চিঠি লিখলুম। এবং করুণানিধান সত্যিই তো কবি ছিলেন। প্রীতি-নমস্কার নিন। ইতি

আপনাদের
হরপ্রসাদ মিত্র

জলপাইগুড়ি

সুরজিত বসু

গল্পকার সুরজিত বসু জলপাইগুড়িতে থাকেন। মন খারাপ হলেই ছুটে আসেন কলকাতায়। এক সময় ২/১টি কবিতাও লিখেছিলেন। শ্রদ্ধেয় বাচ্চুদাকে আমাদের মধ্যে দেখতে চাই।

দেবেশ রায়

শ্রদ্ধেয় গল্পকার দেবেশ রায় কবিতা লেখেন না! আমাদের চোখেও পড়েনি। আমরা দেবেশদার কবিতা ছাপতে চাই।

আবুল কাশেম রহিমুদ্দিন

নামেই পরিচিত। এক সময় প্রচুর কবিতা লিখেছেন! কলকাতার রাস্তায় দেখা হলেই জলপাইগুড়ির কথা জিগ্যেস করেন।

সমীর রক্ষিত

গল্পকার সমীর রক্ষিত কবিতা লেখেন সংখ্যায় কম। কবিতা সম্পর্কে অভিমত কবিতা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সমাজ ভাবনার প্রকাশের মাধ্যম। প্রিয় বিদেশী কবি পাবলো নেরুদা।

নন্দদুলাল সরকার

চল্লিশ দশকে পুরো দস্তুর কবিতা লিখেছেন।

তারপরে আর কিছুই লেখেন নি। 'একটি মুখ' এই নামে একটি কবিতার বই ছাপা হয়েছিল।

অর্ণব সেন

জন্মস্থান জলপাইগুড়ি। চাকুরীসূত্রে আলিপুরদুয়ারে থাকেন। বিদেশী কবিতা অনুবাদ করতে ভালবাসেন।

জগন্নাথ বিশ্বাস

চল্লিশের কবি জগন্নাথ বিশ্বাসের জন্ম আলিপুরদুয়ারে। মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। প্রকৃতির প্রতি তাঁর এক দুর্বার আকর্ষণ আছে। রাত্রি কি কথা বলে

বনের প্রান্তরে গাছের কানে কানে সেই নিভৃত গোপন খবরটি তাঁর জানা। তিনি স্নিগ্ধ ভাষায় নিজের অনুভবকে একান্ত করে প্রকাশ করে থাকেন। কেবল প্রকৃতি বীক্ষণেই যে তার একক ওস্তাদি তা নয়, মানব মনের রহস্য-লোকের অলিতে-গলিতে তার সঞ্চরণ। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ঝিলম ও অনান্য কবিতা'।

বেণু দত্তরায়

আলিপুরদুয়ার কলেজে অধ্যাপনা করছেন বহুকাল ধরে। বয়েসে পঞ্চাশের কাছাকাছি। প্রকৃতি থেকে বুঢ় বাস্তব সমস্তই তাঁর কবিতার আঙিনায় এসো জড়ো হয় এবং আশ্চর্য ইঙ্গিতে কাব্যজগৎকে বৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ করে তোলে। 'শাল মহুয়ার দিন,' 'সোন্যমুখে রক্ত ছিটোই', 'নীল আলোর হরিণ' তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।

বিমল ভট্টাচার্য

'কবিতা শব্দ শিল্প'—সুধীন্দ্রনাথ কথিত এই তত্ত্ব তরুণ বয়েসেই বিমল ভট্টাচার্য প্রমাণ করেছেন তাঁর কবিতায়। জন্ম অধুনা বাংলাদেশ-এর ফরিদপুরে হলেও ছোট থেকেই আলিপুরদুয়ারে মানুষ। অত্যন্ত মিতভাষী কবি ; মিতভাষণের দরুণ শব্দের শক্তি সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবহিত।

সমীর চক্রবর্তী

ক্রুদ্ধ, বিপন্ন, সমকালের বিষবাষ্পে অসহিষ্ণু এই কবির আয়ত্বে ছিল এক ঈর্ষণীয় ধ্রুপদী আংগিক। এখন লেখেন কম। কবিতার বই—যুগ্মভাবে প্রকাশিত, 'হাঙরের ঢেউ আগুনের সেঁক।'

দেশ ভাটিয়া

উজ্জ্বল চেহারার উজ্জ্বল তরুণ কবি দেশ ভাটিয়া তাঁর কবিতাকে দাঁড় করান ঋজু ভংগীতে শক্ত ভিতের ওপর। আজন্ম আলিপুরদুয়ারের ছেলে, সম্প্রতি কলকাতায় আছেন। পুরু লেন্সের চশমার ভেতর দিয়ে তিনি পারিপার্শ্বককে দেখেন তীক্ষ্ণ আড়চোখে। প্রকৃতি ও সমকাল তাঁর সমীপবর্তী হয় হৃদ্য আমন্ত্রণে।

বেণু সরকার

শালিকের মতো তুলতুলে নরম বুকে শব্দকে নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসেন তরুণ প্রতিশ্রুতিময় কবি বেনু সরকার। শৈশব থেকেই আলিপুরদুয়ারে

আছেন। নম্র স্বরের তার কবিতাগুলো অত্যন্ত আত্মগত। ব্যক্তিজীবনের অসম্পূর্ণতাকে কাব্যে পূর্ণ করে তোলাতেই তার সিদ্ধি। তার কবিতার সুর শান্ত মেজাজে ঘরছাড়া বাউলের একতারার করুণ নীড়।

তপনকুমার ঘোষ

কবিতার ঘোররোগে আক্রান্ত তরুণ কবি তপন ঘোষ আজন্ম আলিপুর-দুয়ারে বেড়ে উঠেছেন। তাঁর মেজাজে অস্থিরতা—যেন তাড়া খাওয়া সচকিত হরিণের মর্মান্তিক বিষাদ তাঁর কবিতার রক্ত কর্ণিনিকা করে নীলবর্ণ। শব্দ তাঁর কবিতায় সুপ্ত বারুদের মতো অগ্নিসম্ভব। অবিশ্বাসী, অনিশ্চয়তার মার্কামারা সমকাল যখন তাঁকে ভাবিত করে, কবিতার আতসকাঁচে বোধকে বিম্বিত করে তিনি ভুরু ঘষে বেপরোয়া চোখ তুলে তাকান।

ছানু সাহা

আশা জাগানো এই অতি তরুণ কবিও আজন্ম আলিপুরদুয়ারে মানুষ। কবিতায় তাঁর নানান জিজ্ঞাসা।

তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়

জলপাইগুড়ি শহরে বড় হয়েছেন কিন্তু বর্তমানে বীরপাড়ায় বাস করছেন এই উত্তর তিরিশ কবি। বিভিন্ন মেজাজের, বিচিত্র রুচির, বিবিধ ধরণের কবিতা লিখেছেন তিনি। তার কবিতা থেকে সমকাল, যুগ-মানসকে চেনা কঠিন হয় না। সময়কে অস্বীকার করে, কালকে বাদ দিয়ে তিনি কবি হতে চান না। তাঁর কবিতার নির্দেশ কখনো সোজা জন্মভূমির দিকে। ছন্দের সার্থক প্রয়োগে তাঁর কবিতা প্রাণের আবেগে অনুরণিত হয়ে ওঠে। তার কাব্যগ্রন্থ—যুগ্মভাবে প্রকাশিত ঃ 'হাঙরের ঢেউ আগুনের সেঁক' এবং 'ঢেউ ওঠে মেকঙে পদ্মায়'। রাজবংশী ভাষায় লেখা কাব্যগ্রন্থের নাম 'অললই ঝললই মাদারের ফুল'।

সন্ধ্যাশ্রী চক্রবর্তী

বয়েসে তরুণ এই কবি ছোটবেলা থেকে ময়নাগুড়ীর অধিবাসী। অনুভব ও নারী হৃদয়ের নির্মল উত্তাপ এর কবিতাকে সুখাদ্য করে।

পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্ত

ধূপগুড়িতে বাস করেন। বয়সে তরুণ। 'শব্দ' নামে একটি পত্রিকা বের করেন।

শঙ্কর চক্রবর্তী

তরুণতম কবিদের অন্যতম শঙ্কর চক্রবর্তী আজন্ম ধূপগুড়িতেই বাস করছেন।

অন্যমন দাশগুপ্ত

ধূপগুড়ির আজন্ম অধিবাসী এই তরুণতম কবি আত্মময়, শব্দ সচেতন ও বিশিষ্টবোধে কবিতার সংসারে স্থায়ী বাস খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

জীবন সরকার

অধুনা বাংলাদেশে জন্ম হলেও গল্পকার ও কবি জীবন সরকার ধূপগুড়ির স্থায়ী বাসিন্দা। বয়সে তরুণ। অথচ এক ঈর্ষণীয় সিদ্ধ লেখনী তাঁর করায়ত্ত। একদিকে সমগ্র কাব্যপ্রকরণকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলেন তিনি তার নিজস্ব কাব্যশৈলীর আঘাতে, অন্যদিকে ঐতিহ্যের প্রতি তার স্বনিষ্ঠ সমর্পণ। উত্তর বাংলা থেকে সাম্প্রতিকতম যে সকল কবি বাংলা কবিতার আসরে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তিনি তাঁদের অন্যতম। কখনো তাঁর কবিতায় সমকাল স্বানষ্ঠায় সমুপস্থিত, কখনো বা তিনি জিজ্ঞাসায় অন্তর্লীন, কখনো বা তাঁর অন্তরে এসে পাড়ি জমায় ছেড়ে-আসা সুফলা পদ্মাপারের বাংলার জল. হাওয়া, সোঁদা মাটির গন্ধ। তার কাব্য সংসারের মৌলিক সম্পদ বৈচিত্র্যময় শব্দ ও দৃশ্য, ভাবনার অনুষঙ্গ। অনুভবের কারুময়তায় তাঁর কবিতা নকসী কাঁথার মতো আদরণীয় শিল্প। আপশোষ, এখনো এ-কবির কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি।

জ্যোতিষ ঘোষ

'ক্ষপণক' মাসিক কবিতাপত্রের সঙ্গে যুক্ত। ময়নাগুড়িতে বাড়ী। মাঝেমধ্যে কবিতা লেখেন।

পরিমল দে

রাগী উড়ুক্কু তরুণ। গলায় টোটার মালা। বুকে প্রেমের নীল উল্কি চিহ্ন। ঐতিহ্যের নামাবলী ও খদ্দর যুগপৎ উভয়কেই বর্জন করে তার কবিতা যে-কোন মাচায় লতিয়ে বেড়ায়।

শামসের আনোয়ার

তরুণে কবিদের মধ্যে যথেষ্ট পরিচিত। কলকাতা জলপাইগুড়ি যাতায়াত নিয়মিত ভালোভাবেই রাখেন।

নিখিল বসু

ধূপগুড়ির আর একজন তরুণ কবি। 'পাহাড়তলী'র সম্পাদক। গল্প

লেখেন। এখন শিলিগুড়িতে শিক্ষকতা করেন। কোন কাব্যগ্রন্থ এখনো প্রকাশিত হয়নি। কখনো নিজের দিকে তাকিয়ে শব্দ উচ্চারণ করেন, কখনো আর্ত মানুষের অনুভবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান সহৃদয়তায়।

দেবাশীষ ঘোষ

'সীমান্তিক' পত্রিকার সম্পাদক। মাঝেমধ্যে কবিতা লেখেন। মিষ্টি স্বভাব।

প্রিয়কুসুম চক্রবর্তী

কবিতা লেখেন। 'উত্তর সৈকত' পত্রিকার সম্পাদক। ময়নাগুড়িতে থাকেন। লোকের সংগে মিশতে ভালবাসেন।

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

'বার্তা' পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং মাঝে মধ্যে কবিতা লেখেন।

সতী সেনগুপ্ত

'পাবক' পত্রিকা প্রকাশ করেন ময়নাগুড়ি থেকে। কবিতা লেখেন।

আজিজ চক্রবর্তী

আশীষকুমার চক্রবর্তী পিতৃদত্ত নাম। কবিতা লেখেন ছদ্মনামে। কলিকাতায় চাকুরী করেন।

উদয়ন ভৌমিক

মাঝেমধ্যে কবিতা লেখেন।

নীতিশ বসু

'অরণ্যে' পত্রিকার সম্পাদক। কবিতা লেখেন।

চিত্রভানু সরকার

'সৌধ' পত্রিকার সংগে যুক্ত। সবে কবিতা লিখেছেন ২/১টি কাগজে। স্কুলের ছাত্র। সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুপ দত্ত

কবিতা লিখছেন। বীরপাড়ায় থাকেন। 'বনভূমি' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

রমাপ্রসাদ নাগ

আলিপুরদুয়ারে থাকেন। 'নৌনাই' নামে একটি কাগজের সংগে যুক্ত।

সুমন্ত্র সরকার

অন্যদিনে একটি কবিতা লিখেছেন। 'বুদ্ধদেব' পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

—দিলীপ রুদ্র

মগ্নচৈতন্যের এক তরুণ পথযাত্রী

রাঢ় বাংলার রুক্ষ প্রান্তরে একাকী হেঁটেচলা কোন পথিকের চিন্তার জাল উদাসী বাউলের গানে আজও ছিন্নভিন্ন হয় কিনা জানি না; কিন্তু উত্তর-বাংলার সবুজ বনানী, আপন খেয়ালে এগিয়ে চলা পার্বত্য নদী, সিক্ত মাটি, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে উদাসী হাওয়ার এলোমেলো কাঁপনের মাঝে হাতের একতারায় সুর তুলতে চেষ্টা করেন উদাসী এক বাউল। শুরুতেই বাজে 'খঞ্জনী সুরে বাঁশী' তবুও অনুভবের দ্বারপ্রান্তে হাজির হন 'পাহাড়ী ঢল নামছে গোপন গুহায়' আর জানেন 'মানুষ মানেই ঘর-বিবাগী'। হয়ত এই ঘরবিবাগী মনোভাবই কবি রণজিৎ দেবের অন্ধকারে একাকীত্বের প্রেরণা। আলো-আঁধারী দ্বন্দ্বের মাঝখানে যে পথ তিনি চলতে শুরু করেছিলেন তাতে বিভ্রান্ত হননি তিনি। উপলব্ধি করেন 'প্রচণ্ডতম আলোই' হচ্ছে অন্ধকার। যে তার অন্ধকার তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, অসীমের মাঝে লীলায়িত হওয়ার বদলে তাকে দেয় একাকীত্বের ব্যঞ্জনা। এই একাকীত্ব থেকেই তিনি খোঁজ করেন তার অন্তরস্থিত শ্যামলীমার 'শ্যামলী, শ্যামলী কোথায় আছ।' বলে উঠেন 'ভালবাসা/ঈর্ষা/যন্ত্রণায় প্রভু, আমি/একা রুটি ছিঁড়ে আমি একা জেনে যাই অন্ধকার/বড় অন্ধকার নিয়ে আছি।' এ আর্তনাদ বহুদিন সঞ্চিত বেদনার নয়, এ তার উপলব্ধি। এই উপলব্ধিই জীবনের বালুবেলা থেকে তার হাতে তুলে দেয় পরশমণি, যার ক্ষণস্পর্শে দুঃখ হয় সুখ। তাই অঞ্জলীর হাত পেতে বলে উঠেন 'সারাজীবন দুঃখ তুলে নেবো বুকে, হে পরম করুণা/আমি আনন্দ চাই না, সারাজীবন আনন্দ চাই না'। কারণ 'আলোয় অন্ধকার দেখি, যেহেতু আমার জন্ম অশ্রুর ভিতর।'

অশ্রুর ভিতর দিয়ে রোপণ করা চেতনার চারাগাছ একদিন ফুলে ফলে পল্লবিত হয়ে উঠে, ঊর্ধ্বাকাশে ছড়ায় তার শাখা-প্রশাখা, মাটি থেকে সমৃদ্ধির রস আহরণ করে 'শেকড়গুচ্ছ'। তাই কবি বলে উঠেন—

'নিয়েছি যখন এই জন্ম আমি/তখন/সমস্ত বুকের উপর প্রকাণ্ড গাছ/গোড়ালি অবধি শেকড়গুচ্ছ।

স্বতন্ত্র আঙ্গিকে বক্তব্য রাখবার এই প্রচেষ্টাই কবি রণজিৎ দেবকে কবির ভীড়ে হারিয়ে যেতে দেয় না। তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন 'বৃক্ষের মতন উৎবাহু হয়ে' আর তার সমস্ত সত্তা জুড়ে 'খঞ্জনী গান' বেজে চলে একক স্বরে। তবুও অরণ্যর একাকীত্বকেই তিনি কাম্য মনে করেন 'চারদিকে অনর্গল বৃষ্টিপাত' এরি মধ্যে আসে তার দুঃখের দিনের চিঠি। 'স্বপ্নের পাপড়িতে জেগে উঠে অসহিষ্ণু অবিশ্বাস', ভালবাসা মিশে যায় উন্মত্ত পার্বত্য ঢলে। তার দুঃখের দরোজায় ঝুলে প্রবাস জীবন, তবুও হিজল বনের ছায়া ছেড়ে প্রবাসের হাতছানিতে কবি সাড়া না দিয়ে পারেন না। এই চঞ্চলতা, সুদূরের পিয়াস নিয়ে কবি ধরা পড়তে চান না ক্ষুদ্রতার মাঝে। স্বপ্ন দেখেন 'কেউ কারো চেনা নয়' 'অচেনা দ্বীপের মতো সেই দেশ যেখানে প্রতিভোরে মা আসেন ধূলিকণা ছড়িয়ে দুহাতে নেমে আসা অশ্রুর ঢল নিয়ে। অপ্রাপনীয়কে পাবার এই আকাঙ্ক্ষায় কবি যা পেয়েছেন তাও তার কাছে সামান্যতায় পর্যবসিত হয়। প্রতীক্ষার অন্ধ চোখে এসে আছড়ে পড়ে আলোর বন্যা। ধরাছোঁয়ার বাইরের কোন শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করেন। প্রশ্ন করে উঠেন 'কে তুমি অন্ধস্কুলে ঘন্টা বাজাও'। সমস্ত সত্ত্বায় তিনি অস্তিত্ব অনুভব করেন ইন্দ্রিয়াতীত সেই শক্তির, যাকে তার অন্ধ চোখে তিনি দেখতে পান না, চেতনায় বাজে শুধু তার পবিত্র ঘন্টাধ্বনি। কখনো বা প্রশ্ন করেন 'ধানসিঁড়ি নদীটির পাশ দিয়ে কে তুমি হেঁটে যাও।' প্রশ্ন হারিয়ে যায় ধানসিঁড়ি নদীর কুলুকুলু শব্দের সাথে, প্রতিধ্বনি ফেরে মনের কোণে, পান না কোন উত্তর। 'পড়ন্ত বেলার দুঃখিনী ছায়ায়' মনের কোণে বাজে বিষাদ করুণ রাগিনী। তার অস্তিত্ব অনুভব করেই হয়ত তিনি বলে উঠেন 'হৃদয়েই স্বদেশী দেখি/বাইরে অহর্নিশ পরাধীনতা।' বিশ্বসংসারের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবার জন্য আর্তিতেই কবি বলে উঠেন 'তাকেই আমি আদিম ঘর বলি/শৈশব বলতে যা ছিল আমার।' বাধাবন্ধহীনতার নিজেকে মিলিয়ে দেবার এই মানসিকতাই কবি রণজিৎ দেবের বৈশিষ্ট্য।

উত্তরবাংলাকে তিনি বড় ভালবাসেন। তাই ফুন্টসোলিং, ফলিমারী, সাত মাইল চিলাপাতা ফরেষ্টও তার কাব্য অনায়াসে আপন স্থান করে নেয়। এখানকার ধানের শীষে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি খেলা, ভিজে মাটি, লাস্যময়ী

নর্তকীর মতো আপন খেয়ালে এগিয়ে চলা পার্বত্য নদী, মায়ের স্নেহস্পর্শের মতো বাঁশগাছের সরুপাতায় হাওয়ার সিরসিরে কাঁপন, এ সবই তাঁর অনুভূতির দরোজায় এসে আঘাত করে।

শাখা প্রশাখা শেকড়গুচ্ছে দিয়ে কাব্য সমৃদ্ধির রস আহরণ আজ সম্পূর্ণ প্রায়। চারাগাছ রূপ নিয়েছে ছায়াময়ী বৃক্ষের। অপেক্ষা শুধু ঝুরি নেমে আসার, সৃষ্টি হবে নতুনের। যেদিন উত্তরে হাওয়ার কাঁপন দুঃখের দিনের চিঠি দেবে না নীলবর্ণ খাম, সমস্ত শূন্যতা ভেসে যাবে আনন্দলহরীতে, তখনও হয়ত চেতনার চাবিকাঠি হাতে নিয়ে উদাসী বাউলের মত রণজিৎ দেব কাব্যর একতারা বাজিয়ে যাবেন আপন স্বরে। সেদিনও বাউল কবি রণজিৎ দেবকে চিনে নিতে পাঠক হয়ত ভুল করবে না।

—আশিস নাহা

শাখা প্রশাখা শেকড়গুচ্ছ/রণজিৎ দেব। বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা-৯

সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার

কবি নীরেন্দ্র চক্রবর্তী এ বছর সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন। আমরা তাঁর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

সারা বাংলা সাহিত্য মেলা '৭৫

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী হাবড়া বালিকা বিদ্যালয়ে সারা বাংলা সাহিত্য মেলার এক মনোজ্ঞ আয়োজন সুসম্পন্ন হল। এর ব্যবস্থাপনায় ছিলেন 'দেউটি'। অনেক প্রবীণ ও নবীন সাহিত্যিকদের সমারোহে এই মেলা ভরপুর হয়ে ওঠে।

জাতীয় কবি সম্মেলন

এবার পশ্চিম বাংলা থেকে জাতীয় কবির সম্মান লাভ করলেন 'ধ্রুপদী' পত্রিকার সম্পাদক কবি সুশীল রায়। এছাড়া এবারকার উল্টোরথ পুরস্কারও তাঁকে দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধ ইত্যাদিতেও তিনি সমান খ্যাত। এক কথায় তিনি সব্যসাচী। ডঃ সুশীল রায়ের এই সম্মানের জন্য আমরাও গর্বিত। তাঁর জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক।

ত্রিবৃত্ত পুরস্কার

কোচবিহারের সর্বজন পরিচিত 'ত্রিবৃত্ত' পত্রিকা তাঁদের এবারকার বাৎসরিক পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিট্‌ল ম্যাগাজিন হিসেবে 'অন্যদিন'কেও একটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। আর যাঁরা পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা হলেন– সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—অর্জুন উপন্যাসের জন্য; কৃষ্ণ ধর—কালের রাখাল তুমি ভিয়েতনাম কবিতা গ্রন্থের জন্য দেবেশ রায়—দেবেশ রায়ের গল্পের জন্য, জীবন সরকার—'কাছিম' গল্পগ্রন্থের জন্য এবং হরিশ্চন্দ্র পাল—'উত্তর বাংলার পল্লীগীতি' গ্রন্থের জন্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্মানিত

নাগপুরে বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনে পশ্চিম বাংলা থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে সম্মানিত করা হয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই সম্মান আমাদের গর্বের বিষয়। আমরা তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

পুরুলিয়া জেলা সাহিত্য মেলা

গত ২৬শে জানুয়ারী 'ছত্রাক' পত্রিকার পঞ্চম বর্ষ পদার্পণ উপলক্ষে 'পুরুলিয়া জেলা সাহিত্য মেলা' হয়ে গেল স্থানীয় জেলা প্রাঙ্গনে। এতে উপস্থিত ছিলেন অনেক প্রবীণ ও তরুণ কবি সাহিত্যিক। সভায় লিট্‌ল ম্যাগাজিনের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং অনেক কবি কবিতা পাঠ করেন। নানান পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনী, গান এবং সঙ্গীতায়ন এই মেলার আকর্ষণীয় বিষয় ছিল।

উত্তরের মেলা

১১৭৩-এ যখন ধূপগুড়িতে প্রথম উত্তরের মেলা বসেছিল, তখন ছিল এক চেহারা, কিন্তু ১৯৭৪-এর নভেম্বরের দ্বিতীয়বারের সেখানকার মেলার পরিবর্তন যেন অনেক। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি প্রচেষ্টায় সবাই সচেষ্ট। কবিতার জোয়ার বইছে। অনেক নতুন মুখ। চারদিকে রীতিমত কবিতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কলকাতা থেকে জীবন সরকার, কুমারেশ চক্রবর্তী ও প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় পৌঁছে তাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিলেন। একটা ছোট্ট জায়গায় রীতিমত কবিতার পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য পুণ্যশ্লোক দাশগুপ্তকে সাধুবাদ জানাই। কবিসভায় উপস্থিত ছিলেন—নিখিল বসু, রঞ্জন নাগ, অন্যমন দাশগুপ্ত, সুমন্ত্র সরকার, চিত্রভানু সরকার, দিলীপ সরকার, শংকর চক্রবর্তী, শেখর দত্ত ও প্রবাল দাশগুপ্ত।

সাহিত্য মেলা ঃ '৭৪

'আত্মপ্রকাশ' পত্রিকার উদ্যোগে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে এক সাহিত্য-সম্মেলন হল। সভাপতি ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে অন্নদাশঙ্কর রায় ও সাগরময় ঘোষ। ছোটগল্পের সেমিনারে গল্পের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করলেন দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্লোল মজুমদার, সুব্রত নিয়োগী, শংকর দাশগুপ্ত ও জীবন সরকার। কবিতা পাঠ করলেন নিশীথ ভড়, কার্তিক মোদক, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, ধূর্জটি চন্দ, পরমেশ্বরী রায়চৌধুরী, কমল চক্রবর্তী, বীতশোক ভট্টাচার্য, সুভদ্রা ভট্টাচার্য, প্রদীপচন্দ্র বসু, রাণা দাস, স্বপন মণ্ডল ও সমরেন্দ্র দাস। লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের সেমিনারে বক্তব্য রাখলেন দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কার্তিক মোদক, ধূর্জটি চন্দ, রামচন্দ্র প্রামাণিক ও নিখিলেশ গুহ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গীতা ঘটক ও মায়া সেন। স্বপন সেনগুপ্তের মূকাভিনয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কবি সম্মেলন

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী দক্ষিণেশ্বর ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে এক কবি সম্মেলন হলো। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনালেন, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, অমিতাভ দাশগুপ্ত, জীবন সরকার, তুষারাভ রায়চৌধুরী, শিবাজী গুপ্ত, বিকাশভান, বাণীব্রত চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পণ্ডিত, সুকুমার গরানী, প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

আসানসোলে কবি সম্মেলন

আসানসোলে সম্প্রতি গঙ্গোত্রী পরিষদের আয়োজনে এক কবি সম্মেলন হয়ে গেল। এই সম্মেলনে দিনেশ দাস, হরপ্রসাদ মিত্র, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শান্তনু দাস প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে পরিচালিত হয়েছিল।

কৃষিমেলায় সাহিত্যসভা

রাণাঘাটের স্বাস্থ্যোন্নতি ময়দানে গত ৯ই এপ্রিল বুধবার কৃষিশিল্প স্বাস্থ্য প্রদর্শনী কমিটি ও সীমান্ত সাহিত্যের উদ্যোগে সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি দিনেশ দাস, প্রধান অতিথি শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উদ্বোধক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। কবিতা পাঠ করেন—গোবিন্দ চক্রবর্তী, তারাপদ রায়, শরৎ মুখোপাধ্যায়, শিশির ভট্টাচার্য, প্রণব মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ চক্রবর্তী, রত্নেশ্বর হাজরা, যোগব্রত চক্রবর্তী, ভোলানাথ শীল, কার্তিক মোদক, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ মৈত্র, স্বপন চক্রবর্তী। গল্প শোনান—সুজন চন্দ। স্বাগত ভাষণ দেন—স্থানীয় এম এল এ নরেশচন্দ্র চাকী। ধন্যবাদ জানান—মনোজ ঘোষ। আধুনিক কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন করেন—ঋষিণ মিত্র। এদিন ৭ জন কবি ও ৭ জন গল্পকারকে 'সীমান্ত সাহিত্য' পুরস্কার দানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কবিতায়—অমিতাভ চক্রবর্তী, সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, প্রমোদবিকাশ ভট্টাচার্য, বিপ্লব চন্দ, তেজেশ অধিকারী, জয় গোস্বামী, স্বপন চক্রবর্তী। গল্পে—জীবন সরকার, সমর মুখোপাধ্যায়, সমীরকান্তি বিশ্বাস, কালী চক্রবর্তী, তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ শীল, কণা বসু মিশ্র।

Space Donated by :

IMPRESSION HOUSE

QUALITY COLOURS & JOB PRINTERS

64, SITARAM GHOSH STREET

CALCUTTA-700 009

Phone : 34-7017

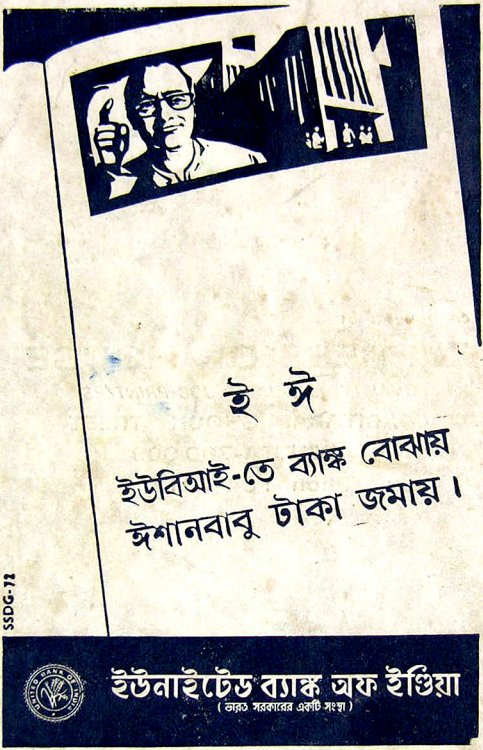
ই ঈ
ইউবিআই-তে ব্যাঙ্ক বোঝায়
ঈশানবাবু টাকা জমায়।
SSDG-72
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)